১

আকাশ-পাতাল ভাবছিলেন নবীন দত্ত। নামে নবীন হলেও বয়সে প্রবীণ। বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। সমস্ত মুখে খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি। অর্থাভাবে ব্লেড কেনা হয় নি। গায়ের গেঞ্জিটা শতছিদ্র। পরনে কালো রঙের মাদ্রাজি লুঙ্গি। কালো রঙের লুঙ্গিই আজকাল কেনেন, কারণ ময়লা হলেও দিন আষ্টেক দশ বেশ পরা যায়, সাবান দেবার দরকার হয় না। হাতের ও পায়ের নখগুলিও বড় বড়। নিজেই ছুরি দিয়ে কেটে নেন। কয়েকদিন থেকে ছুরিটি খুঁজে পাচ্ছেন না। সন্দেহ হচ্ছে তাঁর বড় দৌহিত্র প্রতাপ সেটি গাপ করেছে। ছুরিটি সেকালের রজার্সের ছুরি। আজকাল যে সব ছুরি পাওয়া যায় তাতে কিছু কাটা

যার নাম প্রতাপ কলেজে পড়ে, সেদিন এসেছিল, ছুরিটার ওপর তার অনেক দিন থেকেই লোভ। চেয়েও ছিল একবার, তিনি দেন নি। এবার চুরি করেছে। এম. এ. পড়ছে, কিন্তু চোর। পরীক্ষাও হয়তো চুরি ক'রে পাশ করে। কিন্তু এ নিয়ে নবীন দত্ত আধঘণ্টার বেশী মাথা ঘামান নি। কোনও বিষয় নিয়েই তিনি বেশীক্ষণ মাথা ঘামান না। কারণ মাথা ঘামাবার বিষয় অসংখ্য। কত মাথা ঘামাবেন ? নির্বিকার হতে চেষ্টা করেন। সব সময়ে কিন্তু পারেন না। একটা লাট্টু মনের মধ্যে হরদম ঘুরছে বনবন করে—অর্থাভাব। পেনসনটি আছে অবশ্য—মাসে মাত্র দেড়শ' টাকা। সেটিও আদায় করতে প্রতি মাসেই নাস্তানাবুদ হতে হয়। আর একটি সম্বল আছে একতলার বাড়ি ভাড়া। রিটায়ার করার পর যথাসর্বস্ব খরচ করে—মানে, দেশের সব বিষয়সম্পত্তি বেচে, এক কাঠা জমির উপর চোঙ মার্কা এক চার-তলা বাড়ি করেছিলেন। একতলায় একজন ভাড়াটে আছে। দোতলায় বড় ছেলের বিধবা বউ দুই মেয়েকে নিয়ে থাকে। তে-তলায় থাকেন তাঁর গৃহিণী তাঁর বিধবা শুদ্ধাচারিণী মাকে নিয়ে। চারতলায় থাকে তাঁর ছোট ছেলে। ভাল নাম অহঙ্কার, ডাক নাম ডুম্। ডুম্‌কায় জন্মেছিল বলে সবাই তাকে ডুমকা বলেই ডাকত ছেলেবেলায়। সেইটেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ডুম্। ডুম বিয়ে করে নি। কিন্তু সে একাই একশ'। তার এই চারতলায় দুখানা ঘরে তার শোবার বিছানা, বিছানার চারদিকে বই, একদিকে রেডিও, আর একদিকে জামাকাপড়, আর একদিকে ছবি আঁক-বার ইজেল, রঙের বাক্স, তুলি, আর এক দিকে ফোটো তোলবার ক্যামেরা। আর একটা ঘরে কেবল ছবি, স্বদেশের বিদেশের নানা-

রকম ছবি। কিছু দেওয়ালে টাঙানো, কিছু মেঝেতে স্তূপীকৃত।
বাথরুমে একটা টেবিল আর একটা টুল। টেবিলের উপর
আপিসের ফাইল। সেইখানে বসেই আপিসের কাজ করে রাত্রে।
তুম কখন বাড়িতে থাকে, কখন থাকে না, কেউ বলতে পারে না।
দিনে প্রায়ই থাকে না। বাড়িতে খায় না, হোটেলে খায়। রাত্রে
ফিরেই ঘরে খিল দিয়ে কাজ করে। কখনও ছবি আঁকে কখনও
পড়ে, কখনও আপিসের ফাইল ক্লিয়ার করে। সে যখন এম.
এস-সিতে রসায়ন শাস্ত্রে ফার্স্ট ক্লাস পেল তখন নবীন দত্তই
তাকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তাঁর পূর্বতন এক বন্ধু মার্লো
সাহেবের কাছে। মার্লো সাহেবই তাকে জার্মানীর এক ব্যবসায়ী
ফার্মে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। মাইনে বোধহয় ভালই পায়—ঠিক কত
তা নবীন দত্ত জানেন না, জিজ্ঞেসও করেন নি। কিন্তু সে প্রথম
মাইনে পেয়েই শ' দুই টাকা নবীন দত্তকে এনে দিয়ে ছিল।
নবীন দত্ত বলেছিলেন—-এখন আমার দরকার নেই। তুমি টাকা
ব্যাংকে রেখে দাও, যখন দরকার হবে নেব। কিন্তু আজ পর্যন্ত
নেন নি। একতলা ভাড়া দিয়ে মাসে শ' দুই টাকা পান। তাছাড়া
নিজে টিউশনিও করেন দু' জায়গায়। এককালে ভালো প্রফে-
সার ছিলেন। এককালে অনেক কিছুই ছিলেন তিনি। গায়ক,
লেখক, বিপ্লবী, রাজনৈতিক, কাগজের সম্পাদক—-অনেক কাজই
করেছেন তিনি জীবনে। এখন চারতলা বাড়িটার চিলেকোঠায়
একা থাকেন। দিনে স্বপাকে খান। চাল, কিছু তরকারি আর দুধ
এক সঙ্গে সিদ্ধ ক'রে সেইটে খান বেলা দেড়টা দুটোর সময়।
রাতে আর কিছু খান না। টিউশনি করে ফেরেন রাত দশটায়,
এসেই শুয়ে পড়েন ছাতে। শীত গ্রীষ্ম আকাশের তলাতেই শুয়ে

থাকেন। বৃষ্টি পড়লে অবশ্য ঘরে ঢুকতে হয়। দশটার সময় এসে শুয়ে পড়েন বটে, কিন্তু ঘুম হয় না। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করেন রাত বারোটা পর্যন্ত। তাঁর বড় ছেলে অলঙ্কার কৃতবিদ্য হয়েছিল, ভালো চাকরিও পেয়েছিল। দুটি মেয়ে হয়েছিল তার। বড়টি দশ বছরের এখন, ছোটটি আট বছরের। হঠাৎ মারা গেল অলঙ্কার করোনারি-অসুখে। মেয়ে দুটির পড়াশোনার খরচ আছে, তারপর বিয়ে। না, ঘুম আসে না নবীন দত্তের চোখে। তিনি এপাশ ওপাশ কবেন। ঘুমেব জন্য একটা ট্যাবলেট তাঁর এক ডাক্তার ছাত্র ব্যবস্থা করেছিল। খেয়েছিলেন ক'দিন। তবু ঘুম হয় না। এখন আর খান না।

তাঁর বড় বৌমা সাবিত্রী বি. এ. পাশ। একটা আপিসে চাকরি নিয়েছিল। বাড়ি থেকে বেশ কিছুদূর হেঁটে 'বাস' ধরতে হত। রূপসী সে—এই তাব অপরাধ। একদল অসভ্য ছোঁড়া তার পিছনে লাগল। হাত ধরে টানলও একদিন। চীৎকার করা সত্ত্বেও কেউ এসে বর্বরগুলোকে শাস্তি দিলে না। ভীড় জমে গেল, কিন্তু ভীড়ের ভিতর থেকে কেউ এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করল না এর। মজা দেখতে লাগল কেবল। সাবিত্রী তাব পব থেকে ঘরে বসে আছে। বর্বর দেশে ভদ্রলোকের বাস করা মুশকিল। কিন্তু তবু বাস করতে হবে। সাবিত্রী দুশো টাকা মাইনে পেত তার মেয়েদের পড়াশোনার সব খরচ চালাতে পারত—কিন্তু তা আর হল না। অপমানিত হওয়া সত্ত্বেও সাবিত্রী আবার সেই আপিসে যেতে চেয়েছিল কিন্তু নবীন দত্ত আর যেতে দেন নি। বলেছিলেন, এই অসভ্য দেশে সভ্য কিছু করা যায় না। তুমি বাড়িতেই থাকো, মেয়ে দুটিকে মানুষ কর। আমি যতদিন বেঁচে

আছি খরচ চালিয়ে যাব। টিউশনি করে যে দুশো টাকা পান তা সাবিত্রীকেই দিয়ে দেন। বাকি থাকে সাড়ে তিন শো টাকা। তার থেকে পঁচিশ টাকা পাঠাতে হয় তাঁর কাশীবাসিনী মাকে, জোর করে কাশী চলে গেছেন মা। বার্ধক্যে তীর্থবাস করাই কর্তব্য মনে করেন। নবীন দত্ত তাঁকে বাধা দেন নি। দশ টাকা পাঠাতে হয় তাঁর এক গরীব আত্মীয়াকে, পঞ্চাশ টাকা দিতে হয় তাঁর এক ভাগ্নেকে, সে লক্ষ্ণৌ শহরে বি.এ. পড়ে। তাঁর একমাত্র বোন কালীর বিয়ে হয়েছিল লক্ষ্ণৌ শহরের প্রবাসী বাঙালী শিবসেবকের সঙ্গে। কালীর পুত্রটি খুব শৈশবে কিছুদিন ছিল নবীন দত্তের কাছে। বহুকাল আগে। শিবসেবকের একটা কাপড়ের দোকান ছিল আর ছিল একটি দজ্জাল বিধবা ভগ্নী। নাম বিশাখা। কালীর ছেলে দেবনাথকে সেই মানুষ করেছিল। দেবনাথ যে বছর আই. এ. পাশ করল সেই বছরই শিবসেবক মারা গেলেন। অনেক দিন থেকে ভুগছিলেন তিনি। চিকিৎসা করাতেন না। বিশাখার প্রতাপে কোন ডাক্তারই না কি তাঁর বাড়িতে আসত না। দু'দিন জ্বর না ছাড়লেই বিশাখা ডাক্তারকে তেড়ে যেত। জ্বর কমাতে পার না অথচ ফি নিয়ে যাচ্ছ! টাকা কি খোলামকুচি না কি! শিবসেবকের যক্ষ্মা হয়েছিল। শিবসেবক মারা যাওয়ার পর বিশাখা একদিন দেবনাথকে নিয়ে হাজির হল নবীন দত্তের কাছে। বলল—তোমাদের ছেলে তোমাদের কাছে দিয়ে গেলাম। এর ভার বইবার সামর্থ্য আমার নেই। আমি আমাদের পৈতৃক বাড়ির অর্ধেকটা ভাড়া দিয়ে নিজের খরচ চালিয়ে নেব। কিন্তু ওর পড়ার খরচ, খাওয়ার খরচ তাতে চলবে না। বাড়ির অর্ধেকটা ভাড়া দিলে বড় জোর পনেরো কুড়ি টাকা পাব।

নবীন দত্ত বললেন—কত টাকা হলে ওখানে তোমাদের চলে ? বিশাখা বললে—ওকে যদি কলেজে পড়াতে চান তাহলে টাকা পঞ্চাশেক লাগবে। দেবনাথও তাই বললে—হ্যাঁ, ওর কমে চলবে না। দেবনাথ ভালো ছেলে। ফার্স্ট ডিভিসনে আই. এ. পাশ করেছে। নবীন দত্ত বললেন—বেশ তোমরা লক্ষ্ণৌতেই ফিরে যাও। আমি প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দেব। সেই থেকে দিয়ে যাচ্ছেন। অলঙ্কার যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন কষ্ট হয় নি। এখন কষ্ট হচ্ছে, কারণ সাবিত্রীকে দুশো টাকা দিতে হচ্ছে মাসে মাসে। সে ওইতেই নিজেদের খরচ চালিয়ে নেয়। নিজের আর মেয়ে দুটির জন্যে আলাদা রান্না করে তাদের স্কুলে ভরতি করেছে, ওই থেকে তাদেব কাপড়-জামাও কিনে নেয়। শৌখীন কাপড় আর কেনা হয না। মোটা সাধারণ জামা-কাপড় পরে। আর একটা মুশকিল হয়েছে তাঁর শাশুড়ীকে নিয়ে। শ্যালক দুটিকে যে কোন লোক যদি শালা বলে খুব একটা অন্যায় হয় না। দুটিই মূর্খ শয়তান্। বউগুলিও জুটেছে তেমনি। মায়ের সেবাযত্ন করে না এবং কেন করে না তার দীর্ঘ জবাবদিহি আওড়ায়। নবীন দত্ত শাশুড়ীকে নিজের কাছে এনে রেখেছেন। নবীন দত্তের স্ত্রী পারুলবালা মাকে নিয়েই থাকেন। তাঁর জন্যে রান্না করেন, তাঁর সর্বাঙ্গে তেল মালিশ করেন, তাঁর কাপড় আর বিছানা কাচেন রোজ। কারণ বৃদ্ধা মা রোজই প্রায় বিছানায় মলমূত্রে মাখামাখি হয়ে পড়ে থাকেন। ওঠবার সামর্থ্য নেই। চোখের দৃষ্টি কমে গেছে। চিঁচিঁ করে কি যে বলেন বোঝা যায় না। কানেও বোধহয় কম শোনেন। কিছু বললে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন, কোনও উত্তর দেন না। মাঝে মাঝে কপালে

হাত ঠেকান খালি। চোখ দিয়ে জল পড়ে অনবরত। মাকে নিয়েই পারুলবালা সব সময় ব্যস্ত। নবীন দত্ত তাই স্বপাক খান। শাশুড়ীর জন্য নবীন দত্তের মাসে প্রায় শ' দেড়েক টাকা খরচ হয়। রোজ আপাদমস্তক সরষের তেল মালিশ করতে হয়। সরষের তেল আজকাল দুর্মূল্য। কাপড় বিছানা কাচতে সাবানও অনেক লাগে। তাছাড়া সরু আলোচাল কিনতে হয়। দুধও লাগে প্রায় সেরখানেক করে। পারুলবালা মায়ের জন্যে রাঁধেন, নিজেও ওইখানে খেয়ে নেন। তিনি এককালে মাছ-ছাড়া ভাত খেতে পারতেন না। এখন ক'টা বাঙালীই বা মাছ খেতে পায়? বহুদিন বাড়িতে মাছ ঢোকে না। আলু-ভাতে, ডাল-ভাতে, দিয়েই ভাতটা খেয়ে নেন পারুলবালা। ওর সঙ্গে একটু ঘি থাকলে ভালো লাগত। কিন্তু ঘি কেনবার পয়সা কোথায়। পারুলবালার মা-ও বড়-লোকের মেয়ে ছিলেন, পারুলবালার বাবাও বড় চাকরি করতেন, সুতরাং দুধ ঘি মাছমাংসের অভাব ছিল না কোন দিন। এখন মাকে গলা-গলা সিদ্ধ ভাতে ভাত খাওয়ান পারুলবালা। দুধটা একটু ঘন করে না দিলে মা খেতে পারেন না, তাই দুধটা ঘন করেই দেন, কিন্তু মুশকিল হয়েছে ঘন দুধ পেটে সহ্য হচ্ছে না। অথচ মা পাতলা দুধ কিছুতেই খেতে চান না। সংসারের সব খরচ মিটিয়ে নবীন দত্তের হাতে একশ' পঁয়ষট্টি টাকা থাকে। কিন্তু তা-ও থাকে না শেষ পর্যন্ত। মেয়ের বিয়ের সময় বাড়ি বাঁধা দিয়ে যে টাকা ধার করেছিলেন তা এখনও শোধ হয় নি। প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দিয়ে যাচ্ছেন। এ ঋণ তাঁর জীবনকালে শোধ হবে না বোধহয়। বাড়িটা শেষে বিক্রি হয়ে যাবে। তা ছাড়া বাড়ির ট্যাক্স আছে। সে-ও প্রায় মাসে পঁচিশ টাকা করে।

নবীন দত্ত

অলঙ্কার যখন বেঁচে ছিল তখন বাড়িতে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলত। অলঙ্কার মারা যাবার পর তিনি ইলেক্‌ট্রিক আলো বন্ধ করে ঘরে ঘরে আবার প্রদীপ আর লণ্ঠন চালু করেছিলেন। কিন্তু তুম্ চাকরি পাবার পর আবার ইলেকট্রিক কানেক্‌শন নিয়েছে। ইলেকট্রিক বিল সে-ই দেয়। কারণ তার ইলেক্‌ট্রিক চাই। হাই পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বালিয়ে ছবি আঁকে। সব খরচ মিটিয়ে নবীন দত্তের কাছে একশ' টাকাও থাকে না। তার থেকেও মাঝে মাঝে তিনি পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে বই কেনেন। দুই নাতনীর জন্য টুকিটাকি জিনিস কেনেন। কখনও লজেন্‌স্, কখনও ডাল-মুট, কখনও সন্দেশ। সব দিন পারেন না, মাঝে মাঝে কেনেন। তাঁর নিজের জন্য খরচ হয় দৈনিক প্রায় আড়াই টাকা। দুধ, চাল, তরিতরকারি কিনতেই দু টাকার মতো খরচ হয় মাসের শেষে হাতে বিশেষ কিছু থাকে না। সবাই নিজের কাজ নিজেই করে নেয়, ঝি চাকর রাখবার সামর্থ্য নেই। তবু কিন্তু মুখপুড়ি রোজ আসে একবার। নবীন দত্তের যখন সচ্ছল অবস্থা ছিল তখন মুখপুড়ি ঝি ছিল তাঁদের বাড়িতে। তখন যৌবন ছিল, আদর্শবাদী নবীন দত্তকে ভক্তি করত সে। হয়তো ভালোও বাসত মনে মনে। দেখতে কুৎসিত মেয়েটা। নাম জিগ্যেস করাতে বলেছিল আমার নাম মুখপুড়ি। বলে হেসেছিল মুখে কাপড় দিয়ে। এসব অনেক দিন আগেকার কথা। মুখপুড়ি এখন প্রৌঢ়া হয়েছে। এখন সে ঝি-গিরি করে না। তার ছেলে কোন্ কারখানায় ভালো কাজ করে। মাকে আর এখন ঝি-গিরি করতে দেয় না। মুখপুড়ি কিন্তু নবীন দত্তের বাড়িতে আসে রোজ একবার করে। কখনও কাপড় কেচে দেয়, কখনও আবার বাসন মেজে দেয়। নবীন দত্তের

চিলেকোঠায় উঠতে সাহস পায় না। কখনও পারুলের ঘরে, কখনও সাবিত্রীর ঘরে বসে গল্প করে। নবীন দত্ত বাড়িতেও থাকেন না প্রায়। যেদিন থাকেন সেদিন মুখপুড়ি যাবার আগে তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করে যায় গলায় আঁচল দিয়ে খোলা দ্বারের সামনে। ভিতরে ঢুকতে সাহস পায় না। নবীন দত্ত তন্ময় হয়ে থাকেন নিজের লেখা নিয়ে। নবীন দত্ত নিজের নিদারুণ হতাশাটাকে ঠেকিয়ে রাখেন লেখা দিয়ে। কিছু নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকতে চান তিনি। মুখপুড়ি যখন এসে প্রণাম করে তখন লেখা থেকে মুখ তুলে তার দিকে চান। বলেন—মুখপুড়ি ভালো। আছিস? মুখপুড়ি কোনও উত্তর দেয় না, ঘাড় হেঁট করে চলে যায়। আবার লেখায় মন দেন নবীন দত্ত। একদিন মুখপুড়ি চলে যাবার খানিকক্ষণ পরে নবীন দত্ত লক্ষ্য করলেন একখানা নোট উড়ে বেড়াচ্ছে তাঁর ঘরের সামনে। উঠে গিয়ে দেখলেন দশ টাকার নোট একখানা। কোথা থেকে এল এটা? তাঁর নিজের টাকাকড়ি তো বাক্সে থাকে। এ নোটটা কোথা থেকে এল বুঝতে পারলেন না। তারপর তাঁর হঠাৎ মনে হল মুখপুড়ি এসেছিল সেই ফেলে যায় নি তো? আলাদা করে রেখে দিলেন সেটা। তার পর দিনই তাঁর বড় নাতনী রেবতী একটি রেকাবিতে করে চারটি সন্দেশ, আর তাঁর ছোট নাতনী পার্বতী একটি নতুন কাপড় নিয়ে হাজির হল।

'তোমার আজ জন্মদিন না কি দাদু? পিসিমা তোমার জন্যে তাই এসব নিয়ে এসেছে—'

'পিসিমা মানে? মুখপুড়ি?'

'হ্যাঁ। পিসিমা তো রোজ আসে। কাল দিদার কাছে শুনল যে

আগে তোমার প্রতি বছর জন্মদিনে নাকি ভারি ধুম হত। অনেক-দিন আগে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। পিসিমা বলল, এখন বন্ধ হয়ে গেছে না কি? আমি যখন ছিলাম, তখনও তো হয়েছে। উনি ভীম নাগের সন্দেশ খেতে ভালবাসতেন বলে ভীম নাগের সন্দেশ আনানো হত। আমিও তো খেয়েছি। দিদা বললে, আজকাল আব হয় না, পয়সায় কুলোয় না। অলু চলে যাওয়ার পর আর কিছু হয় না। তাই পিসিমা আজ তোমার জন্যে কাপড় আর ভীম নাগের সন্দেশ এনেছে। আমাদের জন্যেও এনেছে একটা করে।'

নবীন দত্তের মনের ভাব যা হল তা অবর্ণনীয়। কিন্তু সে ভাব তিনি প্রকাশ করলেন না। একটা সন্দেশ তুলে খেলেন। আর কাপড়টা রেখে দিলেন কোণের দিকে আলনায়। কোণের দিকে দড়ির একটা আলনাতে তাঁর জামাকাপড় থাকে। তারপব তিনি বললেন—মুখপুড়িকে পাঠিয়ে দে। রেবতী পার্বতী চলে গেল ছুটে। একটু পরে মুখপুড়ি এসে দাঁড়াল।

'তুমি সেদিন আমার ঘরের সামনে একটা দশ টাকাব নোট ফেলে গেছ। টাকাকড়ি অমন অসাবধানে রাখো কেন? ভাগ্যে আমি দেখতে পেয়েছিলাম, উড়ে বেড়াচ্ছিল নোটটা। এই নাও। আর এই পাঁচটা টাকাও নাও, আমার জন্মদিনে আশীর্বাদ করলাম তোমাকে।'

মুখপুড়ির একবার ইচ্ছা হল বলে, আমি ও টাকাটা আপনাকে প্রণামী স্বরূপই দিয়েছিলাম। কিন্তু সাহস করে আপনার হাতে দিতে পারি নি। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারল না, ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। নবীন দত্তের হাত থেকে টাকাটা নিয়ে আর

একবার ভূমিষ্ঠ হয়েপ্রণাম করল, তারপর চলে গেল। নবীন দত্ত চুপ করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর তাঁর জাবদা খাতাটা বার করে লিখলেন।

'মুখপুড়ি ইজ গ্রেট। মহীয়সী নারী। ও লেখাপড়া জানে না। ওর বংশপরিচয়ও সাধারণ। যতদূর জানি ওর বাবার উপাধি ঘোষ। কায়স্থ হতে পারে, গয়লাও হতে পারে। কিন্তু ওর মহত্ত্ব এত বেশী যে ও অনায়াসে জাতিকুলের গণ্ডী পেরিয়ে গিয়ে স্ব-মহিমায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর সে সম্বন্ধে ও সচেতন নয়, তা নিয়ে আস্ফালন করে না কখনও। সেজন্য আরও গ্রেট। আমাদের সমাজে আস্ফালন-প্রিয় অনেক নর-নারীর সঙ্গে দেখা হয় প্রত্যহ। তারা কথায় কথায় বার বার আত্মমহিমা প্রচার করে। মুখপুড়ি তাদের মতো ধনী নয়, তাদের মতো ডিগ্রিধারী নয়, তাদের মতো উচ্চপদাধিকারী নয়। তবু ও তাদের চেয়ে অনেক বড়। সেদিন ও দশটা টাকা আমাকে দেবে বলেই এনে-ছিল, কিন্তু সাহস করে দিতে পারে নি। তাই দুয়ারের সামনে রেখে গিয়েছিল। আজ যখন আমি ফেরত দিলাম তখনও ও আপত্তি করল না। আমি যে পাঁচ টাকা ওকে দিলাম তা যে এখন দেওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর তা ও ভালো করেই জানে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ও বিনা প্রতিবাদে সেটা নিল—এখানেই ওর মহত্ত্ব। ওর বিনয়, ওর ভদ্রতা মুগ্ধ করেছে আমাকে। এই মুখ-পুড়িরাই আমাদের সমাজকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অবশ্য আর কত দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে জানি না। আমরা দ্রুতগতিতে নতুন রকম পশু হয়ে যাচ্ছি, যে পশুর একমাত্র লক্ষ্য টাকা আর আত্ম-সুখ। ভক্তি শ্রদ্ধাকে অনেকেই শিকেয় তুলে রেখেছে। তাদের

ভালো কথা বললে—তারা বলে—আর জ্ঞান দিতে হবে না। কবি টি. এস. ইলিয়ট দুঃখ করে বলেছেন—

Where is the life we have lost in living ?
Where is the wisdom we have lost in knowledge ?
Where is the Knowledge we have lost in information ?
The cycles of heaven in twenty Centuries.
Bring us further from God and nearer to Dust.

যেখানে অধিকাংশ লোকই পশু কিংবা পশুবৎ তাদের মধ্যে থেকে আদর্শ বজায় রাখা খুব শক্ত। কিন্তু তবু এই শক্ত কাজটাই করতে হবে, তা না হলে বেঁচে থাকার কোনও অর্থ হয় না। তবে, একটা জিনিস বুঝেছি, অপরকে ভালো করা যায় না, প্রত্যেকেই নিজের মতে নিজের পথে চলতে চায়। যা করা সম্ভব সেটা হচ্ছে নিজেকে ভালো করা। তা-ও শক্ত।

নবীন দত্তের এই খাতাটার নাম আধুনিক ভাষায় হয়তো 'জার্নাল' কিন্তু নবীন দত্ত নিজেকে যদিও অতি-আধুনিক বলে প্রচার করেন, কিন্তু খাতাটার কোন নামকরণ করেন নি। খাতার প্রথম পাতায় কেবল লেখা আছে শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং। খেরোয় বাঁধানো মোটা খাতা একটা। এ খাতায় নবীন দত্ত সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যাবে। এমন অনেক গূঢ় খবর যা বাইরের লোকে জানে না। যেমন ধরুন, অর্থাভাব সত্ত্বেও তিনি কেন তাঁর ছেলে হুমের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছেন না, এই খবরটা। খবরটা অতি তুচ্ছ। কিন্তু এই খবরটার আলোকে নবীন এবং হুম্ দুজনেরই চারিত্রিক
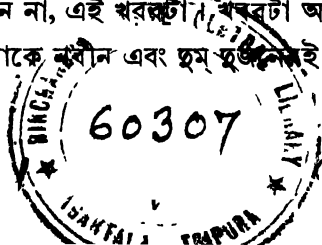
বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একদিন একখানা পোস্টকার্ড কুড়িয়ে পেয়েছিলেন নবীন। সেই পোস্টকার্ডটি পড়ে তাঁর যা মনে হয়েছিল তা তাঁর জাবদা খাতায় লেখা আছে। উদ্ধৃত করছি।

"সিঁড়িতে একটি পোস্টকার্ড কুড়িয়ে পেয়েছি। পোস্টকার্ডটি খুব সম্ভবতঃ ভুমের প্যান্টের পকেট থেকে পড়ে গেছে। কোনও বন্ধুকে চিঠি লিখে পোস্ট করবে বলে নিয়ে যাচ্ছিল বোধহয়, কিন্তু পোস্ট করা হয় নি, পকেট থেকে পড়ে গেছে। কিছুদিন আগেই ভুম একটা ভালো চাকরি পেয়েছে। বন্ধুকে লিখেছে, 'আমার ভাই কত রকম জিনিস কেনবার শখ, কিন্তু টাকায় কুলোয় না। একটা চাকরি পেয়েছি, মাইনে খুব কম নয়, কিন্তু তাতেও আমার কুলোবে না, কারণ বাবাকে তো প্রতি মাসে কিছু দিতে হবে। আমার ছবি কেনার শখ, ছবি আঁকার শখ, তা ছাড়া ফোটো তোলার বাতিকও আছে। আমি প্রকৃতির ছবি তুলি। মানুষের ছবি কদাচিৎ। অনেক ফড়িঙের, অনেক প্রজাপতির, অনেক ফুলের, অনেক সূর্যাস্তের এবং অনেক সূর্যোদয়ের রঙীন ছবি তুলেছি। সবগুলিই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। ধার করে করেছি এসব। এখন চাকরি পেয়েছি, ভেবেছিলাম সে ধারগুলো শোধ করব। কিন্তু বাবাকেও যে প্রতি মাসে কিছু দিতেই হবে। ভাই, চাকরি পাওয়া সত্ত্বেও আমি যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরে রয়ে গেলাম। দেখি, এখন কতদূর কি করতে পারি। বাবাকে যদি টাকাটা না দিতে হত তাহলে হয়তো তোমার ধারটা তাড়াতাড়ি শোধ করতে পারতাম। আমি জানি তুমি বড়লোকের ছেলে, সামান্য হাজার টাকা তোমার কাছে

কিছু নয়, কিন্তু এ-ও জানি, ওটা আমাকে পরিশোধ করতেই হবে, না করলে স্বস্তি পাব না। তবে তোমাকে কিছুদিন সবুর করতে হবে।' এ চিঠিটা আমি পোস্ট করে দিয়েছিলাম, আর সেই দিনই ঠিক করেছিলাম দুমের কাছ থেকে কোনও টাকা নেব না। ও নিজেই বিপন্ন, ওকে আরও বিপন্ন করতে চাই না। বাজে খেয়ালে টাকা নষ্ট করছে বলে ওকে ভর্ৎসনাও করতে চাই না আমি। কোন্‌টা বাজে কাজ, আর কোন্‌টা আসল কাজ তা আমিই কি জানি? মনে হচ্ছে পিতা হিসাবে আমারই বরং এ বিপদে ওকে অর্থসাহায্য করা উচিত। কারণ ও যা করছে তা সৃষ্টিধর্মী কাজ। কোনও দুর্নীতিমূলক কাজ হলে বাধা দিতাম। দিতাম কি? ওকে বাধা দেবার শক্তি আমার আছে কি? তবু ঠিক করলাম ওর কাছ থেকে টাকা নেব না।"

এই জাবদা খাতায় লেখা ছাড়া তাঁর আর একটা অবলম্বন ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর ওই চিলেকোঠার ঘরে একটিমাত্র ছবি টাঙানো আছে। বিদ্যাসাগরের ছবি। মাঝে মাঝে তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন তিনি। কোন বিপদে পড়লে ছবিটার দিকে চেয়ে ভাবেন এ অবস্থায় পড়লে বিদ্যাসাগর কি করতেন। নবীন দত্তর জীবনে কোনও ঠাকুর দেবতা নেই। পূজোবাড়িতে পাঁচ জনের সামনে ঠাকুর দেবতাকে প্রণাম করেন তিনি অবশ্য। নিজের মতামত প্রকাশ করে বাহাদুরি দেখাবার ইচ্ছে তাঁর হয় নি কখনও। কোনও রকম বাহাদুরি দেখানোটা 'ভালগার' মনে হয় তাঁর কাছে। হ্যাঁ, তিনি ঠাকুর দেবতার কাছে প্রণত হন। তাঁদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নন, তবু হন। হন সামাজিকতা বজায় রাখবার জন্য। হন আর একটা কারণেও। ঠাকুর দেবতা

ভগবান কিছুই যে নেই, এরও অকাট্য কোন প্রমাণ কি তিনি পেয়েছেন? পান নি। সুতরাং নাস্তিক্য নিয়ে বাহাদুরি করবার মতো জোর নেই তাঁর মনে। ওসব নিয়ে মাতামাতি করেন না তিনি। বিদ্যাসাগরের ছবি যেমন তাঁকে নীরব ভাষায় বলেছিল, ঘুমের কাছ থেকে টাকা নিও না, তেমনি বলে ছিল ঈশ্বর-টিশ্বর নিয়ে বেশী মাথা ঘামিও না। ঈশ্বরচন্দ্র নিজেও এ বিষয়ে খোলা-খুলি কিছু বলেন নি। বুদ্ধদেবও বলেন নি। ও প্রশ্নের সামনে চিরকাল একটা রহস্য-যবনিকা ঝুলছে। ঝুলুক। নবীন দত্ত ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না ঠিক করেছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, তবু মাঝে মাঝে ঘামাতে হচ্ছে। এ নিয়ে কারো সঙ্গে তর্ক করেন না অবশ্য, কিন্তু নিজেরই মনে বারবার প্রশ্ন জাগে। ভগবান সত্যিই কি নেই? এত বড় নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করলে কে তাহলে? আপনা-আপনি ঘটনাচক্রে হয়ে গেছে? ধোঁয়া দেখলে যেমন মনে হয় কোথাও না কোথাও আগুন আছে, তেমনি সৃষ্টি দেখ-লেই মনে হয় নিশ্চয় এক বা একাধিক স্রষ্টাও আছেন। এই স্রষ্টার স্বরূপ নিয়ে অনেক বিদ্বান ব্যক্তি মাথা ঘামিয়েছেন। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তিরা নবীন দত্তকে বিশেষ আশ্বাস দিতে পারেন নি। তাঁরা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির আস্ফালন করেছেন কেবল। সে আস্ফালন মাঝে মাঝে বেশ চমকপ্রদ, মাঝে মাঝে বেশ কৌতূ-হলজনক, মাঝে মাঝে 'বাঃ' বলতে ইচ্ছে হয়েছে তাঁর। কিন্তু তার থেকে মনের স্থায়ী কোন অবলম্বন পান নি নবীন দত্ত। যখন চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে তখন আলো জ্বালতে পারে নি কেউ। সার্কাস বা ম্যাজিক দেখে যেমন সাময়িক বিস্ময় বোধ করেছেন, ওই সব বড় বড় দার্শনিকদের বই পড়েও তেমনি করে-

ছেন। যে সত্যের উপর নির্ভর করা যায়, যে সত্য সমস্ত সন্দেহ নিরসন করে দেয়, সে সত্যের দেখা কখনও পান নি। অথচ এরকম সত্যকে অপরোক্ষ করেছেন এ রকম লোকের অভাব আমাদের দেশে নেই একথাও তো ঐতিহাসিক সত্য। এই সেদিনই তো শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, মহর্ষি রমণ এদেশে ছিলেন। তাহলে —অন্ধকাবেব মধ্যে ওই 'তাহলে'টাই প্রলুব্ধ করে তাঁকে মাঝে মাঝে —আলেয়ার মতো। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয় ও রকম লোক এখনও আছেন কি ? থাকলেও তিনি কোথায় আছেন, কে তার সন্ধান দেবে, তাঁর কাছে গেলেও তিনি কি তাঁকে প্রশ্রয় দেবেন, যদি দেনও তাঁর উপদেশ তিনি কি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করতে পারবেন এই বৃদ্ধ বয়সে ? এই সব কথা মনে হয় মাঝে মাঝে। যদিও তিনি আধ্যাত্মিক নন, তবু এই সব চিন্তা অনেক সময় অন্যমনস্ক করে দেয় তাঁকে। এই অন্য-মনস্ক হয়ে থাকাটাও তাঁর একটা বিলাস, অমীমাংসিত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় যেমন অনেকে, অনেকটা তেমনি। সেদিন— যেদিন এই গল্পের আরম্ভ—সেদিন কিন্তু এসব নিয়ে ভাবছিলেন না তিনি, ভাবছিলেন আর একটা বিষয় নিয়ে। আকাশ পাতাল ভাবছিলেন। তাঁর এক ছাত্র তাঁকে একটি প্রস্তাব দিয়েছে। তিনি এককালে নামজাদা অধ্যাপক ছিলেন। যদি নোট বই লিখতেন তাহলে বড়লোক হতে পারতেন। কিন্তু তিনি লেখেন নি। তাঁর ধারণা নোট বই লিখলে সেটা চালাবার জন্যে এমন সব লোকের দ্বারস্থ হতে হয় যাদের দ্বারস্থ হবার প্রবৃত্তি তাঁর কোনদিন হয় নি। এ-ও তাঁর কানে গেছে এসব ব্যাপারে ঘুষ-ঘাসও না কি দিতে হয় নানা জায়গায়। তাই ও চেষ্টাই তিনি করেন নি

একজন জার্মান বিজ্ঞানী খুব প্রশংসা করেছেন। যে জার্মান ফার্মে ও চাকরি পেয়েছে সেখানে ওকে কেরানীগিরি করতে হয় না। গবেষণা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে হয় জার্মানিতে। ওর চাকরি দশটা পাঁচটা আপিসের চাকরি নয়। অধিকাংশ সময় কাটাতে হয় লাইব্রেরিতে না হয় ল্যাবরেটরিতে। চরক সুশ্রুত পড়তে যেতে হয় কবিরাজদের কাছে। তুমের সম্বন্ধে ভাবনা নেই নবীন দত্তের। ও নিজের পথ কেটে নিজেই বেরিয়ে যাবে। নবীন দত্তের ভয় উনি নিজে ওর স্বচ্ছন্দে চলার পথে বিঘ্ন হয়ে না দাঁড়ান। অনেক দিন আগে তাঁর এক সতীর্থ পরমেশ রায় তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—তোমার ছেলেরা কি তোমাকে দেয় কিছু? নবীন উত্তর দিয়েছিলেন—আমি ওদের কাছ থেকে নিই না কিছু। বিজ্ঞের মতো হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—শাক দিয়ে মাছ আর কত ঢাকবে ভাই। নিতে চাইলেও আজকাল-কার ছেলেরা দেবে না কিছু। আজকাল যে জেনারেশন গ্যাপ হয়েছে সে গ্যাপ লাফিয়ে পার হওয়া শক্ত। কথাটা শুনে চটে উঠেছিলেন নবীন। বলেছিলেন—লক্ষ্মীছাড়া পরিবারে জেনা-রেশন গ্যাপ সেকালেও ছিল, আর একালেও আছে। যে সব পরিবারে বাপ মা'রা ছেলেদের দায়িত্ব নেয় না, যাদের ছেলে মেয়েরা পথে-ঘাটে কুকুর-বিড়ালের মতো মানুষ হয়, অনেক সময় যাদের পিতৃপরিচয়ও অস্পষ্ট—এদের মধ্যে জেনারেশন গ্যাপ তখনও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু ভদ্র ভালো পরিবারে নেই। কর্তব্যপরায়ণ ছেলেমেয়ে, কর্তব্যপরায়ণ বাপ মা এখনও এদেশে অনেক আছে। সেখানে গ্যাপ ট্যাপ নেই। জেনারেশন গ্যাপ কথাটি বিলিতী প্রপাগাণ্ডা। প্রত্যেক পরিবারে পিতামাতা

আর পুত্রকন্যাদের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করবার একটা কৌশল। বিদেশীরা আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়। ওতেই ওরা ওস্তাদ। ওরা হিন্দু মুসলমানে ঝগড়া লাগিয়েছে, ভাষায় ভাষায় ঝগড়া লাগিয়েছে, ধনিক আর শ্রমিক নামক দুটো দল তৈরি করে তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করেছে। 'ক্ষয়' শব্দটার সঙ্গে 'অব' উপসর্গ জুড়ে অবক্ষয় নামে এমন একটা আওয়াজ সৃষ্টি করেছে যেন মনে হচ্ছে ওইঅবক্ষয় আগে ছিলনা, এখন হয়েছে, এবং আমরা যতদিন স্বাধীন থাকব, চলতে থাকবে। ওই বিদেশী ধূর্তেরা আমাদের দেশের লোককে টাকা দিয়েই এই সব বিষ ছড়াচ্ছে এই দেশে। বোকারা চিরকাল গরীব ছিল, পিছনে পড়ে ছিল, আগেও ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। বুদ্ধিমানরা যে কোন পরিস্থিতিতেই ওপরে উঠে যাবে। এসব নতুন কিছু নয়। বিদেশী শত্রুদের ভাঁওতায় ভুলো না। নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে ভাববার চেষ্টা কর। ভালো মন্দ সব সময়েই ছিল, সব সময়েই থাকবে। আমি তো আমার চেনাশোনা যে ক'টি ভালো পরিবার জানি, সেখানে জেনারেশন গ্যাপ নিয়ে কোনও হা-হুতাশ শুনি নি। যেখানে শুনেছি সেখানে পরিবার-টাই খারাপ—সেখানে মদ মেয়েমানুষের মৈচোট্। সেখানে শুধু জেনারেশন গ্যাপ কেন সবই ফরদাফাঁই। এই ধরনের পরিবার আজকাল ডিগ্রির জোরে, চাকরির জোরে কিংবা রাজনীতির জোরে অনেক সময় ওরা ভদ্র পরিবার বলে পরিচিত হয়। কিন্তু ওরা ভদ্র নয়, ওরা ছদ্মবেশী ছোটলোক। নবীন দত্তের এই আকস্মিক উষ্মায় পরমেশবাবু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন একটু। বলেছিলেন—অত চটছ কেন? আজকাল ছেলেমেয়েদের কাণ্ড

কারখানা যা দেখি তাতে পিলে চমকে যায়। যা খুশি করে বেড়াচ্ছে। কাজের মতো কাজ একটাও করছে না। সবই প্রায় অকাজ। এরও উত্তর দিয়েছিলেন নবীন দত্ত। বলেছিলেন—ওদের আমরাই কাজে লাগাতে পারছি না। আমাদের শিক্ষাটাও বর্তমানে ভুল পথে চলছে। যে ভালো মিস্ত্রি হতে পারত সে হচ্ছে কেরানী, যে বড় শিল্পী হতে পারত সে হচ্ছে কেরানী, যে বড় ব্যবসায়ী হতে পারত সে হচ্ছে কেরানী। দেশে ভালো দরজি নেই, ছুতোর নেই, সৎ ব্যবসায়ী নেই, আছে কেবল ঝাঁক ঝাঁক ডিগ্রিধারী কেরানী, যাদের পেটে বিদ্যেও নেই, অন্য কোন কাজ করবার যোগ্যতাও নেই, যাদের একমাত্র লক্ষ্য চাকরি—যে চাকরিও তারা ভালোভাবে করে না। ছেলেবেলা থেকে ওরা পাকা ইমারতে বসে ফ্যানের তলায় মানুষ, তাই পরবর্তী জীবনেও কোনও ইমারতে চেয়ার টেবিলের সামনে ফ্যানের তলায় বসে চাকরি করতে চায়। হয়তো চাওয়াটা স্বাভাবিক। নিজেরা মেহনত করে কিছু করতে পারে না, কিন্তু অবসর সময়ে মেহনতী মানুষদের নিয়ে বক্তৃতা করে। এদের আমরা যদি কাজে লাগাতে পারতাম তাহলে দেশের চেহারা ফিরে যেত। কিন্তু আমরা ওদের কাজের লোক না করে ক্রমাগত সেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে যাচ্ছি যেখানে বিশ্বের বিদ্যা দূরে থাক সামান্য বিদ্যালাভও হয় না, যেখানে মানুষকে অমানুষ করবার নানা আয়োজন ও উদাহরণ সর্বদা মজুত। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েই কিন্তু চাকরি চাই। বেকার সমস্যা—। রাজনৈতিক আন্দোলন, কাগজে কাগজে ফাটাফাটি। চাকরি-দেনেওয়ালাদের সর্বাঙ্গ তৈলাক্ত, সুপারিশ, ঘুষ। এই হচ্ছে, বুঝলে। আমাদের ছেলে-

দের আমরাই বিপথে ঠেলে দিচ্ছি। ওদের দোষ দিও না, দোষ আমাদের। তোমার ছোট ছেলেটা কি করছে? পরমেশ কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন—এবারও আই. এ. ফেল করেছে ভাই। কি যে করি—। নবীন দত্ত বললেন, ওকে কলেজ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পত্রপাঠ কোনও কাজে লাগিয়ে দাও। যে কোন কাজ। ফেরি করুক, রিক্শা টানুক, মোটর ড্রাইভারি শিখুক, এনি ওয়ার্ক। পরমেশ আপত্তি করলেন। বললেন—ওকথা আজকাল অনেকেই বলছে। কিন্তু একটা ভদ্রলোকের ছেলের পক্ষে ফেরিওলা বা রিক্শাওলা হওয়াটাই কি আদর্শ হওয়া উচিত? একথা শুনে অধীর হয়ে উঠেছিলেন নবীন দত্ত। বলেছিলেন, দেখ ভাই, আদর্শের সঙ্গে পেশার কোনও সম্পর্ক নেই। মানুষ হওয়াই সকলের আদর্শ হওয়া উচিত। তা যে কোন কাজ করেই হওয়া সম্ভব। যাব বড় হবার আগ্রহ আছে, সে যে কোনও অবস্থা থেকেই তা হতে পারে। ওদেশের অনেক বড় লোক অনেক নিম্নস্তর থেকে জীবন শুরু করেছিলেন, কেউ চায়ের দোকানে কাপ ডিস ধুতেন, কেউ কাগজ ফেরি করতেন, কিন্তু তাতে তাঁদের বড় হওয়া আটকায় নি। এদেশেও বিস্তব উদাহরণ আছে। স্বাধীন পেশা করলেই মনুষ্যত্ব বজায় থাকে, চাকবি করলে প্রায় থাকে না। আমি তো কাউকে বরাবর ফেরিওলা বা রিক্শাওলা বা মুটে হয়ে থাকতে বলছি না। কিন্তু কুঁড়ে হয়ে ঘরে বসে থাকার চেয়ে, কিংবা রাজনৈতিক দলের খপ্পরে পড়ে শ্লোগান দিয়ে বেড়ানোর চেয়ে—ওসব কাজ ঢের ভালো, ঢের সম্মানজনক।

পরমেশ খোঁচা দিতে ছাড়েন নি। বলেছিলেন—তবে তোমার দুটি ছেলেকেই চাকরিতে ঢুকিয়েছিলে কেন? সদর্পে উত্তর দিয়েছিলেন নবীন দত্ত—আমি ঢোকাই নি, ওরা নিজেদের জোরে ঢুকেছিল, কমপিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে নিজেদের বিদ্যার জোরে। সবাই যদি ওদের মতো চাকরি পায় পাক না। কিন্তু খোলামকুচির টুকরো যদি হীরের দরে বিকোতে চায় তাহলেই তো মুশকিল। কথাটা বলেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন নবীন দত্ত। নিজের ছেলেদের সম্বন্ধে এ রকম আস্ফালন করাটা ভালো হল কি? কিন্তু ঝোঁকের মাথায় এ রকম অনেক অশোভন কাজ করে ফেলেন তিনি। পরে আপসোস হয়। অলঙ্কার মারা যাওয়ার পর তাঁর মাঝে মাঝে অযৌক্তিকভাবে মনে হয়েছিল পরমেশের কাছে নিজের ছেলে নিয়ে অমন গর্ব করেছিলাম বলেই কি ভগবান অলঙ্কারকে কেড়ে নিলেন? ভগবান কি ইচ্ছে করলেই কিছু দিতে পারেন বা কেড়ে নিতে পারেন? এসব অমীমাংসিত প্রশ্নের কোন জবাব নেই, তবু কিন্তু কথাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন নি তিনি। বার বার মনে হয়েছিল, এখনও হয়।

সেদিন বিদ্যাসাগরের ছবির দিকে চেয়ে বসেছিলেন নবীন দত্ত। ভাবছিলেন ছেলেটা এখনি তো আসবে। তার লেখা নোট বুকে নিজের নামটা ধার দেবেন কি না তা ঠিক করতে পারেন নি। এ অবস্থায় পড়লে বিদ্যাসাগর কি করতেন? ছবিটার দিকে চেয়ে বসেছিলেন তিনি, আর নিজের খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়িতে হাত বুলোচ্ছিলেন। ঝড়াং ঝড়াং শব্দ ভেসে আসছিল একটা। দূরে কোথায় যেন কারখানা আছে, সেখান থেকেই শব্দটা হয়।

নবীন দত্তের মনে হয় কোনও শক্তিশালী দানব বুঝি অত্যাচার করছে কারো উপর। ওই শব্দটা যেন অত্যাচারিতের আর্তনাদ। যখন প্রথমে বাড়ি করে এখানে এসেছিলেন তখন শব্দটা খুব খারাপ লাগত। এখন সয়ে গেছে। হঠাৎ খাপছাড়াভাবে মনে পড়ল অলঙ্কারের প্রথম মেয়ে রেবতী যখন হল তখন খুব কাঁদত মেয়েটা। দিনরাত কাঁদত। অসহ্য মনে হত প্রথম প্রথম। তা-ও পরে সয়ে গিয়েছিল। এখন রেবতী কাঁদে না, হাসে। হাসি থেকে মুক্তো ঝরে। আবার বিদ্যাসাগরের ছবির দিকে চাইলেন তিনি। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল তাঁর। বিদ্যাসাগর নিজেই তো অনেক স্কুলপাঠ্য বই লিখে নিজে ছাপিয়ে বাজারে বার করতেন। বইয়ের ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের নাম কোথাও ধার দেন নি তো কখনও। সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ তিনি ছেড়ে দিলেন রসময় দত্তের সঙ্গে মতের মিল হল না বলে। বলেছিলেন, আলু পটল বেচে খাব। কিন্তু আলু পটল বেচতে হয় নি। ইংরেজি ভাষা শিখলেন নিজের চেষ্টায়। শোভাবাজার রাজবাড়ির জামাতা অমৃতলাল মিত্র এবং শ্রীনাথ দত্তের কাছে রোজ ইংরেজী শিখতে যেতেন। ক্রমশ নিজে বই লিখতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে 'বাসুদেব চরিত', তারপর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', তারপর 'বাংলার ইতিহাস।' তারপর ছাপাখানা করলেন নীলমাধব মুকুজ্যের কাছে টাকা ধার করে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মার্শাল সাহেব তাঁর ছাপা বই কিনলেন অনেক। ধার শোধ হয়ে গেল। হুহু করে অনেক কথা মনে পড়ল নবীন দত্তের। কে যেন তাঁর মনের ভিতর বলে উঠল—বই বেচে টাকা রোজগার করতে

চাও তো নিজে লেগে পড়। নাম ধার দেবে কেন? ফাঁকি দিয়ে কিছু হয় কি? ছাত্রটি যদি সত্যি ভালো ছেলে হয় সে ব্যবসায়ে তোমার সহকারী হোক। মদনমোহন তর্কালঙ্কার বিদ্যা-সাগরের সহকারী ছিলেন এ বিষয়ে। তারপরই মনে হল আজকাল মার্শাল সাহেবের মতো লোক পাওয়া যাবে কি? পাওয়া যাবে কি নীলমাধব মুকুজ্যে আর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মতো বন্ধু? আরও খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন বিদ্যাসাগরের ছবির দিকে। কেমন যেন ক্ষোভ ঘনিয়ে উঠল মনের ভিতর। এ যুগে কি সবই খারাপ? সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, তা হতেই পারে না। বিদ্যাসাগরের সময়ে খারাপ লোক যে অনেক ছিল তার প্রমাণ আছে। তাঁর ঘরে ডাকাতি করেছিল, তাঁর ঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল, তাঁকে ঠকিয়েছিল, তাঁর নামে কুৎসা ছড়িয়েছিল। কিন্তু সে যুগেও বিদ্যাসাগর ভালো লোকের দেখা পেয়েছিলেন। এ যুগেও ভালো লোক নিশ্চয়ই আছে। আমি নাগাল পাই নি। কেন পাই নি? সবার মধ্যেই একটা না একটা খুঁত দেখতে পেয়েছি। মার্শাল সাহেব, নীলমাধব মুকুজ্যে, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দুর্গাদাস বাঁড়ুয্যে—এঁরা কি নিখুঁত ছিলেন? নিখুঁত মানুষ তো হতেই পারে না। নিশ্চয়ই কিছু খুঁত ছিল তাঁদের। তবু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। ভালবাসার জোরেই খুঁতকে উপেক্ষা করা যায়। বিদ্যাসাগর ওদের ভালবাসতে পেরেছিলেন বলেই ওঁরা ওঁর অকৃত্রিম বন্ধু হয়েছিলেন। এর পরই একটা নিদারুণ সত্যের মুখোমুখি হলেন তিনি। তাঁর জীবনে প্রকৃত বন্ধু একটাও নেই। তাঁর চাকরি জীবনে যে সব সহকর্মীর সঙ্গে চাকরি করতেন তাঁদের একজনকেও বন্ধু করতে পারেন নি

তিনি। সবারই সঙ্গে কেমন যেন একটা মুখোশ-পরা সম্পর্ক ছিল। ঈর্ষাও ছিল পরস্পরের মধ্যে। বিলেত-ফেরত ডক্টার সেনকে তাঁর মনে হত চালিয়াত। বিলেত-ফেরত বলে তাদের সবাইকে ডিঙিয়ে ওপরে উঠে গেছে। এজন্য ঈর্ষাও হত। ঘৃণা করতেন প্রফেসার মিত্রকে ছাত্রীদের সঙ্গে প্রেম করতেন বলে। অনুকম্পা হত প্রফেসার মুখার্জির উপর। ছাত্র-ছাত্রীদের মনোহরণ করতে পারেন নি ভদ্রলোক। তোত্‌লা ছিলেন একটু। তাঁর ক্লাসে পা ঘষত, শিস দিত সবাই। কোনদিন বোর্ডে লেখা থাকত —আই, ক্লডিয়াস। রোমান সীজার ক্লডিয়াস তোত্‌লা ছিলেন। আই ক্লডিয়াস রবার্টসের লেখা বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস। প্রফেসার মুখার্জি প্রায়ই রেগে ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসতেন। তোতলামির জন্যেই কারো সঙ্গে মিশতেন না বোধহয়। নবীন দত্ত শুনেছিলেন লোকটা নাকি বিদ্যার জাহাজ। একজন হোমরা-চোমরা সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতার জোরে চাকরিটি পেয়েছিলেন। সব সময়ে তাঁর তোত্‌লামি থাকেও না। ভয় পেলে বা রেগে গেলেই কথাগুলো আটকে যায়। লোকটার উপর অনুকম্পা হত নবীন দত্তের। যার প্রতি অনুকম্পা হয় তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় না। পরমেশ লোকটা দুঃখী। তিনবার বিয়ে করেছে। দেখা হলেই দুঃখের কাঁদুনি গায় আর ঘোঁট করবার চেষ্টা করে। ওর সঙ্গেও মেলে নি নবীন দত্তের। এক পাল ছেলেমেয়ে নিয়ে টিউশনি করে, নোট লিখে, ধার করে আর নানারকম শেয়ার কিনে, নানা ফন্দি-ফিকির করে সংসার চালায় লোকটা। বন্ধুত্ব হওয়া দূরে থাক লোকটাকে দেখলেই অঙ্গ জ্বলে যায় নবীন দত্তের। প্রফুল্ল আইচ লোকটার সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে পারতো। ও লোকটার অনেক গুণ।

কিন্তু এমন আর ফদ্‌ফদ্‌ করে এমন অনর্গল বকে যে মুখ দিয়ে থুথু ছিটকে বেরোয় -ওর কাছে বসাই শক্ত। বন্ধুত্ব হবে কি করে? তবে ওর প্রবন্ধ পড়ে মুগ্ধ হন নবীন দত্ত। না, নবীন দত্ত কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারেন নি। যখন বিপ্লবী ছিলেন, মানে যখন পলিটিক্‌স করতেন তখনও মনের মতো মানুষ পান নি। সেখানেও যেন একটা প্রতিযোগিতা, সেখানেও দলের যিনি কর্তা তার মন রাখবার জন্যে ঠেলাঠেলি ভীড়। সেখানেও নির্বাচন, সেখানেও নিজের দলে লোক টানবার জন্যে অশোভন প্রয়াস এবং তার জন্যে অনেক সময় অসাধু আচরণ। সেখানে বন্ধুত্ব তো হয়ই নি কারো সঙ্গে. দলাদলির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে হাবুডুবু খেয়েছিলেন কিছুদিন। সেখান থেকে পালিয়ে বেঁচেছিলেন শেষ পর্যন্ত। তারপর কাজ করেছিলেন কয়েকটা সাময়িক পত্রিকার আপিসে। সেখানেই ওই কুৎসিত দলাদলি। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে হিংসে করে মনে মনে—বিশেষত সে যদি প্রতিভাবান হয়, প্রত্যেকেরই চেষ্টা কি করে অপরকে চেপে আমি পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়াব। প্রফেসারি যতদিন পান নি ততদিন পেটের দায়ে এই নরকবাস করতে হয়েছিল তাঁকে কিছুদিন। যেদিন তাঁর লেখা না ছেপে এক কাগজের মালিক তাঁর এক মোসায়েবের লেখা ছাপলেন সেদিন বড় কষ্ট হয়েছিল তাঁর। মুখ ফুটে বলতে পারেন নি কিছু, চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে আসবার মতো কোমরের জোরও ছিল না তখন। পারুলকে নিয়ে তখন স্যাঁতসেঁতে একটা একতলা বাড়িতে থাকতেন. একটি মেয়ে হয়েছে—যা পেতেন তাতে অত্যন্ত টানাটানি করে চলত। সুতরাং চাকরিটা ছাড়তে পারেন নি। সেখানে হোমরাচোমরা

কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভবই ছিল না, সবাই তাঁরা নিজেদের লাটবেলাট মনে করতেন, তাঁর সঙ্গে মুখে একটা ভদ্রতা বজায় রাখতেন বটে, কিন্তু মনে মনে করতেন অনুকম্পা। এদের কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে কি করে? বন্ধুত্ব মানে প্রেম। এদের মধ্যে এক-জনও প্রেম জাগায় নি তাঁব মনে। জাগিয়েছিল বরং রামরতন। সে ছিল প্রুফরীডার। কমবয়সী ছেলেটি। অর্থাভাবে লেখাপড়া শিখতে পারে নি। কিন্তু ভারী সুন্দর স্বভাব ছিল তার। ভালো প্রুফ দেখত। মাইনে পেত মাত্র পঞ্চাশ টাকা। তাকে ভালো-বেসেছিলেন নবীন দত্ত। বাড়ি ফেরার পথে তারই সঙ্গে গল্প করতে করতে যেতেন ট্রাম ধরবার জন্যে। মাঝে মাঝে তার বাড়িও গেছেন। বাড়িতে বিধবা মা ছিলেন কেবল। আপনার মাকে দেখেছিলেন তাঁর মধ্যে। সত্যি বাঙালী মায়ের রূপ দেখেছিলেন। তাঁর আগ্রহে মাঝে মাঝে চা আর মুড়ি খেতেন তিনি রামরতনের বাড়িতে। কখনও কখনও বেগুনিও ভেজে দিতেন তিনি তার সঙ্গে। চা করতেন। অতি ছোটখাটো ঘরোয়া সুখদুঃখের গল্প করতেন, পলিটিক্স বা সাহিত্য, চীন বা রাশিয়া নিয়ে আসর জমাবার ক্ষমতাই ছিল না তাঁর। পাড়াপড়শীর কথাই বলতেন বেশী। রামরতন তাঁর বন্ধু হতে পারে নি কিন্তু। বুদ্ধির জগতে অনেক পার্থক্য ছিল দু'জনের। স্নেহ করতেন তিনি রামরতনকে। তার-পর রামরতনও হারিয়ে গেল। যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল আর ফেরে নি। নবীন দত্ত তার বাড়িতে তবু গিয়েছিলেন একদিন। দেখ-লেন সেখানে অন্য ভাড়াটে। বাড়িওলা বললেন—রামরতনের মা দেশে গেছেন। তাঁর দেশ কোথায় তা তিনি বলতে পারলেন না। ওরা হারিয়ে গেল নবীন দত্তর জীবন থেকে। অতীতের এই সব

স্মৃতি মন্থন করতে করতে আর একবার তিনি বিদ্যাসাগরের ছবিটার দিকে চেয়ে দেখলেন। অদ্ভুত একটা কৌতুক যেন চকমক করছে তাঁর চোখের কোণ দুটিতে। মনে হল তাঁর অবস্থা দেখে মনে মনে হাসছেন যেন তিনি। যেন বলছেন—বাপু, ও রকম কি হয় কখনও ? মানুষ কি না ভালোবেসে থাকতে পারে ? তুমিও ভালোবেসেছ নিশ্চয়, কাকে ভালোবেসেছ সেটাও তোমার অজানা নেই। কিন্তু সত্যটাকে আমল দিতে লজ্জা হচ্ছে তোমার। লজ্জার কি আছে এতে। সহসা বিদ্যুৎ-চমকের মতো সত্যটা উদ্ভাসিত হল নবীন দত্তের মনে। মনে পড়ল অলঙ্কারকে আর ঝুমকে। দুটি ছেলেকেই ভালোবেসেছিলেন তিনি। কেবল পিতৃসুলভ ভালোবাসা নয়। ওরা যদি মেয়েমানুষ হত তাহলে এটাকে অনায়াসে রোমান্টিক ভালোবাসাও বলা চলত। অপত্য-স্নেহের উপর এমন একটা রঙের ছোপ লেগেছিল যা সত্যিই মাতিয়ে তুলেছিল তাঁকে। তাঁর এভাব তিনি গোপন রাখতেন। ওদের কাছেও তা প্রকাশ করেন নি কখনও। বরং ওদের কাছে একটু বেশী গম্ভীর হয়ে থাকতেন। রোমান্টিক বলছি এই কারণে যে রোমান্সের রমণীয়তা, অনিশ্চয়তা, আশা আশঙ্কা সবই ছিল সে ভালোবাসার মধ্যে। অলঙ্কার অনেক দিন আগে চলে গেছে। ওর মেয়ে দুটোকে তত ভালো লাগে না কিন্তু। কেমন যেন লোভী-লোভী ধরনের। বোধহয় দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হচ্ছে বলেই ওরকম হয়েছে। ভালো লাগে না, কিন্তু মায়া হয়। অলঙ্কার তাঁর স্বপ্নলোক আলো করে এখনও আছে। মাঝে মাঝে চোখ বুঁজে তার কথা ভাবেন। তাঁর ছেলেরা রূপবান নয় কেউ। অলঙ্কার তো কালোই ছিল। বেঁটেও ছিল একটু। কিন্তু চোখের

দৃষ্টি কী স্বপ্নময়। মনে হত সে যেন এ জগতের লোক নয়। সর্বদাই অন্যমনস্ক হয়ে থাকতো। পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল, ইতিহাসের ছাত্র ছিল সে। ইতিহাসের রূপকথালোকেই ঘুরে বেড়াত যেন। নবীন দত্ত সে স্বপ্নলোকে প্রবেশ করতে পারতেন না। ইতিহাসের বই পড়লেই ঘুম পেত তাঁর। অলঙ্কার কিন্তু ওই ইতিহাসের অরণ্যে কিসের যেন সূত্র খুঁজে বেড়াত। মনে হত যেন পরশমণি খুঁজছে। নবীন দত্তর মনে হয়—হয়তো এখনও খুঁজছে। অনেক দূরে মনের সুদূর প্রত্যন্ত প্রদেশে এখনও তিনি মাঝে মাঝে দেখতে পান স্বপ্নাচ্ছন্ন অলঙ্কারকে। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয় সে চলে গেছে ভালই হয়েছে। বেঁচে থাকলে বাস্তবের রূঢ় আঘাতে তার স্বপ্ন ভেঙে যেত। ইর‍্যাসমাস (Erasmus) কিংবা শেলীর (Shelly) মতো কষ্ট পেতে হত। গেছে, বেশ গেছে। ভোগেও নি বেশী। হঠাৎ হার্টফেল। এক মিনিটেই সব শেষ। বেশ গেছে। অলঙ্কার আর নাগালের মধ্যে নেই, তাকে ইচ্ছে করলে আর দেখতে পাবেন না, শোকের জ্বালা নেই ক্ষতির দুঃখ নেই, কিন্তু ওই রোমান্টিক ভাবটা এখনও আছে। মনে হয় ঘোর অন্ধকারের মধ্যে অনেকদূরে যেন একটা আলোকিত বন্দর দেখতে পান। সেদিকে মনে মনে আকুল হয়ে চেয়ে থাকেন তিনি। এ আকুলতা রোমান্টিক আকুলতা, যে আকুলতা নিয়ে রাধা মথুরার রাজা শ্রীকৃষ্ণর কথা ভেবে বিরহের কুয়াশায় পথ হারাত। অলঙ্কারের যবনিকা পড়ে গেছে, কিন্তু পড়েও যেন পড়ে নি। যবনিকার ওপারে এমন একটা জ্যোতির্ময় লোক দেখা যাচ্ছে যার জ্যোতি অনির্বাণ।

দুম যদিও অন্যরকম, একেবারে অন্যরকম, তবু তাকেও ঠিক ওই

রকম রোমান্টিক ভালোবাসাই বেসেছেন নবীন দত্ত। আরও বেশী করে বেসেছেন কারণ তুম আরও অনিশ্চিত, আরও দুর্বোধ্য। আরও গোপনচারী। অত্যন্ত স্বল্পভাষী সে। বাড়িতে কখন আসে, কখন যায়, তাও জানা যায় না সবসময়ে। তার পদশব্দ বা কথা শোনবার জন্য নবীন দত্ত উৎকর্ণ হয়ে থাকেন, কিন্তু কচিৎ শুনতে পান। খুব ছেলেবেলায় তাকে নিজে যখন পড়াতেন তখন লক্ষ্য করেছিলেন খুব কম সময়ের মধ্যে সে পড়া শিখে ফেলত আর বাকি সময়টা সে কাটাত বাড়ির চারদিকে ঘুরঘুর করে। ড্রয়ার খুলে কখনও এটা হাঁটকাচ্ছে, কখনও ওটা হাঁটকাচ্ছে, কিংবা বাড়ির সামনে যে ছোট মাঠটা ছিল সেই মাঠে গিয়ে হয় ঘুড়ি-ওড়ান দেখছে, না-হয় প্রজাপতির সন্ধান করছে। না-হয় হাঁ করে চেয়ে আছে আকাশের দিকে। প্রতিবেশীর বাড়িতে যাওয়া মানা ছিল, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে বেশী মিশতে দিতেন না তিনি নিজের ছেলেদের। তবু বাইরে গিয়ে মাঠে দাঁড়িয়ে তুম্ যেন বাইরের বিশ্বের স্পর্শলাভ করবার চেষ্টা করত। কেমন যেন একটা উৎসুক কৌতূহলী ভাব। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরীদের মনের ভাব যেমন হয় অনেকটা তেমনি। আর একটা উপমাও তাঁর মনে হত। ঐতিহাসিক উপমা। কিন্তু খুব লাগসই নয়। কোথায় যেন পড়েছিলেন যে প্রাচীনকালে ফিনিশিয়ানরাই সবপ্রথম সমুদ্রযাত্রা করেছিল। অকুল সমুদ্রে পাল তুলে নৌকো ভাসিয়েছিল অজানা দেশের উদ্দেশে, সমুদ্র আর আকাশ যে চক্রবাল রেখায় মিশেছে সেই সীমারেখা তারাই নাকি লঙ্ঘন করেছিল সর্বপ্রথম। তাদের এই চরিত্রের সঙ্গে তুমের খানিকটা মিল আছে, কিন্তু অমিলও অনেক। তারা ছিল অর্থগৃধ্নু বেনের

দল, সংস্কৃতির ধার ধারত না, তাদের কোনও পিরামিড নেই, টাওয়ার আর ব্যাবেল নেই, তাদের টাকার গুদাম টায়ার আর সিডন কবে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। ভুম কিন্তু টাকাকড়ি বিষয়ে ঠিক উল্টো। খরচ করেই ফতুর চিরকাল। নবীন দত্ত ছেলেদের হস্টেলে রেখে পড়িয়েছিলেন। একদিন হঠাৎ লক্ষ্য করলেন ভুম বড্ড রোগা হয়ে গেছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন টাকা ধার করে একটা টাইমপিস কিনেছে। সেই ধার শোধ করছে জলখাবার না খেয়ে। জিজ্ঞেস করেছিলেন—টাইমপিসটা কোথা? টাইমপিসটা ছিল, কিন্তু গোটা ছিল না। ভুম সেটার যন্ত্রপাতি খুলে খুলে দেখেছিল। বললে—আমি ওটা আবার ঠিক করে দিতে পারি কিন্তু দুটো স্ক্রু (screw) হারিয়ে গেছে। অনেক দোকানে খুঁজেছি পাই নি। নবীন দত্ত মুখে ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন, মনে মনে কিন্তু তিনি এমন একটা লোকে চলে গিয়েছিলেন যার আভাস আমরা মাঝে মাঝে পাই, কিন্তু যা প্রায়ই আমাদের নাগালের বাইরে থাকে।

হঠাৎ নবীন দত্তের মনে হল, আমি যদি বইয়ের ব্যবসা করি ভুম আমার সহকারী হবে কি? হবে না। সে রসায়ন নিয়ে গবেষণা করছে, তার সঙ্গে দোকানদারী খাপ খাবে না। করলে কি তিনি খুশী হতেন? না, হতেন না। ভুম দোকানের আপিসে বসে কেরানীগিরি করছে বা বই বেচবার জন্যে ইস্কুলে ইস্কুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে এ কল্পনা করাও অসহ্য তাঁর পক্ষে। কিন্তু তবু তিনিই আবার তার সহকারিতাও কামনা করতেন। তিনি জানেন সোনার পাথর বাটি হওয়া অসম্ভব, কিন্তু আশ্চর্য অসম্ভবের দিকেই মনটা ঝুঁকে পড়তে চায় বার বার সেকালের অ্যালকেমিস্টদের

মতো, যারা অ-সোনা থেকে সোনা বানাতে চাইত।

আবার চাইলেন তিনি বিদ্যাসাগরের ছবির দিকে। দেখলেন চোখের কোণে কৌতুকের সে ছটা আর নেই। বিদ্যাসাগর যেন ভাবছেন, কি যেন ভাবছেন একটা। একটি ভাবনাই তিনি সারা জীবন ভেবেছিলেন—কি করে এই হতভাগা দেশের উন্নতি করা যায়। সেই ভাবনাটাই আবার পেয়ে বসেছে না কি তাঁকে। সে যুগে তিনি বিধবা-বিবাহ দেবার জন্য প্রাণপণ করেছিলেন। তাঁর একটা জোরালো যুক্তি ছিল ছোট ছোট মেয়ের সঙ্গে অনেক বুড়োর বিয়ে হয়, ফলে অকালবৈধব্য হয় তাদের, তাদের আবার বিয়ে না দিলে তারা কু-পথে যাবে। মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছিলেন, তারা যদি লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তাহলে পেটের দায়ে কু-পথে যাবে না। এখন বিদ্যাসাগর এ দেশের শত শত কুমারী অবিবাহিতা মেয়েদের দেখতে পান কি? সচ্ছল অবস্থার ব্যভিচারিণী মেয়েদের খবর রাখেন কি, যারা মোটরে চড়ে অভিসারে যায়—যাদের মধ্যে সধবা, বিধবা, কুমারী সব আছে? হঠাৎ বিদ্যাসাগরের চোখের ভাষার রং বদলে গেল, মনে হল রেগে গেলেন তিনি। বাঙ্ময় হয়ে উঠল তাঁর দৃষ্টি – তুমি আমার কথা ভাবছ কেন, নিজের চরকায় তেল দাও। পশু চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে, কামড়াবে, লাথি ছুঁড়বে, পেখম মেলবে, নাচবে, কুঁদবে। ওদের নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নি, চেষ্টা করেছিলাম অসহায় কতকগুলো ভদ্র মেয়েকে বাঁচাতে। তাদের মধ্যে কিছু বেঁচেছে, এইতেই আমি খুশী। তুমি আমার কথা ভেবো না, নিজের চরকায় তেল দাও। বইয়ের ব্যবসা যদি করতে চাও, নিজে ব্যবসাতে নাম। প্রায় সঙ্গে

সঙ্গেই সেই ছেলেটি এসে হাজির হল। নবীন দত্ত বললেন—বেশ, নোট তুমি বার কর। আমি নতুন নোটও তোমাকে লিখে দেব। নগদ টাকা দিতে হবে না। আমি তোমার দোকানে গিয়ে বসব রোজ। যা লাভ হবে আধাআধি আমরা নেব। তুমি রাজী আছ?

ছেলেটি একটু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর বলল—'আমাদের দোকানে আপনি বসতে পারবেন না স্যার। সে একটা গলির গলি তস্য গলির মধ্যে। কোনক্রমে একফালি ঘর পেয়েছি। উপরে নীচে, আশেপাশে সব দোকান। চারদিকে ময়লা, ভ্যাপসা গন্ধ, মানুষগুলো পোকার মতো কিলবিল করছে, আপনি সেখানে এক মিনিটও বসতে পারবেন না। আপনার দোকানে বসবার দরকার কি স্যার?' 'আমি নিজেই দেখতে চাই ব্যবসাটা। তাতে তো তোমাদের সুবিধেই হবে। হিসেবপত্র আমিই রাখব। তোমরা বাইরে ঘুরবে। কেন সেখানে বসতে পারব না বলছ? আমি এককালে বস্তিতে খোলার ঘরে থাকতুম।' রাখাল হেসে বললে, 'আপনাদের আমলে বস্তিও বাসযোগ্য ছিল। এখন ভদ্রপাড়াও বাসের অযোগ্য হয়ে গেছে। আমাদের যেখানে দোকান সেটা তো একটা নরক।' নবীন দত্ত চটে উঠলেন। বললেন, 'আমি বাপু নরকেই যদি বসতে পারি তোমার আপত্তি কেন। তোমার দোকান যাতে ভালোভাবে চলে সেই চেষ্টাই করব বলে ওখানে বসতে চাচ্ছি। শুধু আমার নামটা ধার দেব কেন, ব্যবসাটার যাতে উন্নতি হয় সেই চেষ্টা করব। তোমার আপত্তি কেন এতে।' রাখাল চুপ করে রইল। তারপর বলল—'একটা কথা জিজ্ঞেস

করছি স্যার, কিছু মনে করবেন না।' নবীন দত্ত বললেন, 'কিছু মনে করব কি না, সেটা নির্ভর করছে তুমি কি জিগ্যেস করবে তার উপর। অত ভণিতার দরকার কি, কি বলতে চাও বল না।' রাখাল মাথা চুলকে একটু ইতস্ততঃ করে বলল—'আপনি কি অবিশ্বাস করছেন আমাদের? তাই কি দোকানে বসতে চাইছেন?' নবীন দত্ত হেসে ফেললেন। বললেন, 'বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নই আসে না এখন। কিছুদিন না মিশলে তো বোঝাই যায় না কে কেমন। তবে ভদ্রলোকমাত্রেই বিশ্বাস করতে চায়। ঠকতে পারি এ সম্ভাবনা আছে জেনেও করতে চায়। তোমাকে পড়িয়েছি, ছাত্র হিসাবে তুমি ভালো ছিলে। তোমাকে অবিশ্বাস করবার কোনও কারণ তো নেই। আমি দোকানে বসতে চাইছি, কারণ আমিও একটা কাজ চাই। দোকানে বসেই লেখাপড়া করব। তোমাদের ব্যবসাটাও দেখব! তার মানে, তোমাদের মতো আমিও এখন বেকার। আমিও একটা কাজ চাই।' রাখাল বললে —'আপনি কিন্তু স্যার ওখানে বসে লেখাপড়া করতে পারবেন না। চারদিকে খালি হট্টগোল।' এর পর নবীন দত্ত কি বলতেন কি করতেন তা আর জানা গেল না। দুম্ দুম্ করে দুম এসে হাজির হল। বলল, 'বাবা, আজই আমি জার্মানি যাচ্ছি। কিছু টাকা তোমার কাছে দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ যদি কোনও দরকার হয় খরচ কোরো, আর তুমি বাড়িতে থেকো। মায়ের শরীরটা ভালো নয়। দিদিমার শরীর আরও খারাপ। দরকার হলে কোন বড় ডাক্তারকে ডেকো।' নবীন দত্ত হকচকিয়ে গেলেন। বললেন, 'হঠাৎ জার্মানি যাচ্ছিস কেন? এতো টাকাই বা পেলি কোথা?'

'আমি বেল নিয়ে কিছু রিসার্চ করেছি। পেপারগুলো ওদের পাঠিয়েছিলাম। ওরা আমার সঙ্গে এ বিষয়ে সামনাসামনি আলাপ করতে চায়। টাকা ওরাই দিয়েছে, আমি বলেছিলাম বাড়িতে কিছু টাকা রেখে না গেলে আমি যেতে পারব না। ওরা সে টাকাও দিয়েছে। হয়তো পরে আমার মাইনে থেকে অ্যাডজাস্ট করে নেবে। জানি না—'

নবীন দত্ত নোটের গোছার দিকে চেয়ে বললেন—'কত টাকা আছে এতে ?'

'পাঁচ হাজার টাকা।'

নবীন দত্ত গুম্ হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

'কখন যাবি ?'

'দুঘণ্টা পরে আমার প্লেন ছাড়বে।'

'পাসপোর্ট, ভিসা ?'

'সে হয়ে গেছে। আমি চললুম তাহলে।'

প্রণাম করে হুম চলে গেল। তখ্খুনি ফিরে এল আবার।

'আমি রাঘবকে বলে গেলাম সে এসে তোমাদের রোজ খোঁজ-খবর নেবে। যদি কিছু দরকার হয় তাকেই বোলো।'

'রাঘব কে ?'

'রাঘব আমার বন্ধু। আমার আপিসে কাজ করে।'

'এসব হাঙ্গামা করতে গেলে কেন ?'

'হাঙ্গামাটা কি ?'

'একজন ভদ্রলোক রোজ আসবেন আর জিগ্যেস করবেন কি আমাদের দরকার এই বাধ্যবাধকতার মধ্যে কেন ফেলছ তাঁকে ? আর সব দরকার কি সকলকে বলা যায় সব সময়ে—তুমি মানা

করে দাও ওঁকে।'

'দরকার বোঝ, তুমিই মানা করে দিও। চললুম—' আবার নেমে গেল হুম।

নবীন দত্ত চুপ করে রইলেন। রাখাল একটু মুচকি হেসে বললে —'উনিই কি আপনার ছেলে এ. দত্ত?'

'এ. দত্ত বলছ কেন? অমল দত্ত, অধীর দত্ত, অবিনাশ দত্ত, অসভ্য দত্ত, অলস দত্ত, অগা দত্ত - সবাই এ-দত্ত। ও তার একটাও নয়। ও হচ্ছে অহঙ্কার দত্ত। আমার নোটবুকে তুমি যেন এন. দত্ত ছেপো না। নবীন দত্ত ছাপবে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, নবীন দত্তই ছাপব। নামটা ছাপবার অনুমতি দিচ্ছেন তাহলে?'

'দিচ্ছি, কিন্তু একটি শর্তে। তোমাদের দোকানে গিয়ে যখন বসবার উপায় নেই, আমার ছেলে না ফেরা পর্যন্ত বাড়িতেই থাকতে হবে আমাকে, কিন্তু দোকানের সব কাগজপত্র আমার কাছে প্রতি রবিবারে নিয়ে এস। আমি বাড়িতে বসেই তোমাদের দোকানের খবর রাখব। খবর রাখব তোমাকে অবিশ্বাস করছি বলে নয়, কর্তব্য বলে।'

রাখাল বলল—'বেশ, তাই হবে। এখন তবে যাই!'

প্রণাম করে রাখাল চলে গেল।

নবীন দত্ত চুপ করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর নিজের জাবদা খাতাটা পেড়ে লিখলেন—

হুম হুম্ করে জার্মানি চলে গেল। আমাদের দেশের অতীশ দীপঙ্কর তিব্বত গিয়েছিলেন অনেক কষ্ট করে জ্ঞান আহরণের

জন্য। পায়ে হেঁটে হিমালয়ের শীতকে উপেক্ষা করে গিয়েছিলেন তিনি। আমাদের সবস্কুছেলেরা এখন যান এরোপ্লেনে করে। অতীশ দীপঙ্করের সময় প্লেন থাকলে তিনিও হয়ত প্লেনেই যেতেন। অতীশ দীপঙ্কর আর তুমের উদ্দেশ্য একই—জ্ঞান আহরণ। তবু কিন্তু কেন জানি না, অতীশকে উচ্চতর আসনে বসাতে ইচ্ছে করছে আমার। মনে হচ্ছে—রেল, প্লেন, জাহাজ যদি না থাকত তাহলে কি তুম জার্মানি যেত? বলতে ইচ্ছে করছে—যেত, নিশ্চয়ই যেত, কিন্তু আমার মনের মধ্যে অতি-অভিজ্ঞ হতাশাবাদী যে লোকটি আছে, সে বলছে যেত না। এ সংশয় নিরসন করা যাবে না। সুতরাং এইখানেই থামলুম ঃ এই পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে কি করি এখন? ব্যাঙ্কে রাখব? তাহলেই তো ইনকম ট্যাক্সের লোকেরা ধরবে। ঠিক আছে, আমার ঘরে যে বড় পিতলের ফুলদানীটা আছে, যাতে এখন ফুল সাজাবার ক্ষমতা নেই আমার, যাতে এখন নানাবিধ আবর্জনা জমে আছে, সেইখানেই রাখব টাকাগুলোকে। রেখে তার উপর একটা ময়লা রুমাল গুঁজে দেব। ওর চেয়ে বেশী সাবধানতা অবলম্বনের দরকার নেই। আমার ঘরে কেউ আসে না। তুম বলে গেছে আমি যেন বাড়ি থেকে না বেরুই। তার মায়ের শরীর খারাপ, তার দিদিমা এখন-তখন। তা কি আমি জানি না? তাঁদের কিছু হলে ডাক্তার ডাকতেই তো ছুটোছুটি করতে হবে আমাকে। দূরে শুনতে পাচ্ছি একদল চোং-প্যান্ট-পরা ছেলে হই হই করছে ঃ মাঠে হাল্লা করছে ঃ ক্রিকেট খেলছে তারা। তাদের এ উৎসাহ আমার মনে উদ্দীপনা সঞ্চার করছে না, রাগ হচ্ছে। তার মানে, আমি ওদের কাছ থেকে অনেকদূর সরে

এসেছি। বুড়ো হয়ে গেছি। বুড়ো হওয়াটা কোন অপরাধ নয়, স্বাভাবিক নিয়মে সবাই বুড়ো হয়। বুড়ো বয়সেরও একটা আলাদা রূপ আছে, যা তরুণদের নেই, কিন্তু সেই রূপকে অক্ষত অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে সংসারের হই-হুল্লোড় থেকে দূরে থাকতে হয়। আমাদের দেশের জ্ঞানীরা বিধান দিয়েছিলেন পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ। কিন্তু এ যুগে সে বন নেই। আছে নানা রকম শৌখীন বন সেখানেও ভীড়, সবাই গিয়ে পিকনিক করে। তাই নিজেই নিজের চারদিকে একটা 'তফাৎ যাও' মনোভাব সৃষ্টি করেছি। কারো কাছে যাই না, কাউকে কাছে আসতেও উৎসাহ দিই না। তবু আসে, ক্রমাগত আসে। আমি তট, ওরা ঢেউ। ক্রমাগত ধাক্কা মারছে।'

জাবদা খাতাটা মুড়ে রেখে আবার চুপ করে বসে রইলেন। বিদ্যাসাগরের দিকে চাইলেন একবার। বিদ্যাসাগর যেন বললেন, দেখ বাপু, আর যা-ই কর, নাকে কেঁদো না। বিধবা-বিবাহ দিতে গিয়ে আমার যখন ৮৪,০০০৲ টাকা দেনা হয়েছিল তখনও আমি নাকে কাঁদিনি। আমার হ'য়ে যাঁরা নাকে-কেঁদে জনসাধারণের কাছে ভিক্ষাপাত্র প্রসারিত করছিলেন তাঁদের আমি মানা করে-ছিলাম। মনে হচ্ছে তুমিও কৃপা ভিক্ষা করছ। ভিক্ষা পেলেও সে কৃপা তুমি নেবে কেন? তোমার ছেলের টাকাটা রেখে দাও, সে এলে ফেরত দিয়ে দিও। ও তোমাকে ঘরে বন্দী হয়ে থাক-বার হুকুম দিয়ে গেল। তোমার স্বাধীনতার দাম কি মাত্র পাঁচ হাজার টাকা?'

খাতাটা তুলে রেখে ঘড়ি দেখলেন দেড়টা বেজেছে। এইবার খেতে হবে। ইক্‌মিক কুকারে চাল-ডাল, দুধ, আলু, পটোল

চড়িয়ে দিয়েছেন সকালে। এতক্ষণে হয়ে গেছে নিশ্চয়। উঠে কুকারটায় হাত দিয়ে দেখলেন। এখনও একটু গরম আছে। খেতে যাবেন এমন সময় তুমের মা এসে হাজির হল। তাঁর হাতে একটা বাটি।

'মা আজ আদা-লাউ খেতে চেয়েছিলেন। তাই করেছিলাম, একটু। তোমার জন্যেও এনেছি, তুমি তো ভালোবাসতে আগে—'

প্রফুল্ল হলেন নবীন দত্ত।

'এখনও বাসি। তুম্ তোমার সঙ্গে দেখা করে গেছে?'

'গেছে। আমার ভালো লাগছে না। কি যে ও করবে শেষ পর্যন্ত ভগবানই জানেন। অত দূর দেশে এখন হঠাৎ গেলই বা কেন, তা-ও বুঝতে পারছি না। রায়েদেব ছেলেটা বিলেত গিয়েছিল আর ফেরে নি। সেইখানেই বিয়ে করে বসবাস করছে। আর আসবেও না শুনছি—'

'এ দেশে ফিরে কি লাভ হ'ত! এ দেশে আমরা কি সুখে আছি? এখানে তোমার ছেলের উন্নতি হলে কেউ খুশি হ'ত না। সকলেরই বুক জ্বলত, চোখ টাটাত। বিষকুম্ভ পয়োমুখ আমাদেব আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা—। সামনে খুব গদ্‌গদ পিছনে ফিরলেই ভুরু নাচায়।'

'কিন্তু এদের মধ্যেই আমরা এতকাল বেঁচে আছি তো। এদের নিয়ে আমাদের সাধ-আহ্লাদও মিটেছে এতকাল।'

'আমাদের পূর্বপুরুষরা মধ্য এশিয়া থেকে এদেশে এসেছিলেন, জান?'

'তাই না কি?'

'দাও তোমার তরকারিটা শুধু মুখেই খেয়ে ফেলি। আমার ওই

ঘ্যাটের সঙ্গে ভালো লাগবে না।'

পারুলবালা বাটিটা দিলেন।

বললেন—'আমিই তো তোমাকে ফুটিয়ে দিতে পারি দুটো। কিন্তু তোমার শখ ওই রকম ঘ্যাঁট করে খাওয়া।'

'চমৎকার হয়েছে আদা-লাউ। সেদিনের পোস্তটাও বেশ হয়েছিল। মা কেমন আছেন এখন?'

'মা আর বাঁচবেন না। আমরা যত্নের ত্রুটি করছি না। তবুও মনে শান্তি নেই। ছেলেদের নাম করছেন দিনরাত। ওরা তো একবার এসে খোঁজও করে না।'

নবীন দত্ত কোন উত্তর দিলেন না। আদা লাউয়ের বাটিটা চেটে চেটে খেতে লাগলেন। শালাদের সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করে পারুলবালার মনে কষ্ট দিতে চান না তিনি।

পারুলবালাকে বললেন, 'ইক্‌মিকটা খোল। খাওয়াটা শেষই করে ফেলি। বেরুতে হবে একবার।'

পারুলবালা ইক্‌মিকটা খুলে দেখলেন একটা বাটিতে রয়েছে কি রকম যেন একটা থকথকে জিনিস। আর একটা বাটিতে একটা ঝিঙে, একটা আলু, আর একটা বেগুন। নীচের বাটিতে ডাল খানিকটা। মসুর ডাল।

'নামিয়ে ওই থালায় ঢেলে দাও। সব চটকে খেয়ে ফেলব।'

'নুন তেল দেবে না।'

'দরকার নেই।'

'ওপরের বাটিতে এটা কি?'

'চরু। ঘি দুধ আর চাল। ভালো চরু ইক্‌মিকে হয় না। যা হয় বেশ লাগে।'

পারুলবালা সবগুলো একটা কানা-উঁচু থালায় ঢেলে দিলেন। সেগুলো চট্‌কে ফেললেন নবীন দত্ত। তারপর সপাসপ করে খেয়ে ফেললেন সেটা। পারুলবালা নীরবে দেখলেন, হঠাৎ তাঁর বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। মনে হল এই লোকটার খাওয়ার তরিবৎ করবার জন্য তাঁকে চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকতে হত। মাছ, মাংস, নানারকম নিরামিষ তরকারি, ক্ষীর, দই সব রকম ব্যবস্থা রাখতে হত। আর আজ ওই লোকটা যেন পিণ্ডি গিলছে।

বললেন 'এসব ভালো লাগে? আগে তোমার খাওয়ার কত শখ ছিল।'

'আগে তো কত কিছু ছিল। মাথায় কোঁকড়া চুল ছিল, এখন আছে? আগে ফুলেল তেল মাখতাম, এখন মাখি? আগে মাসে বারোশো টাকা রোজগার করতুম, এখন করি? পৃথিবীর নিয়মই এই। সব বদলে যায়। তুমি বদলাও নি? তোমার মাথার সামনে টাক পড়েছে, গাল তুবড়ে গেছে, কোমরে ব্যথা, বুক ধড়ফড়। আগে এসব ছিল? আগের কিছুই থাকে না। ওই কৌটোটাতে দেখ তো হরতুকি আছে কিনা—'

পারুল কৌটোটা তাক থেকে পেড়ে খুলে দেখলেন।

'না নেই। কাল মুখপুড়িকে দিয়ে আনিয়ে নেব।'

'আমি এখনি বেরুব। কিনে আনব। মুখপুড়িকে ফরমাস কোরো না, ও দাম নিতে চায় না। তোমার খাওয়া হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'শুয়ে পড়গে তাহলে। আমি বেরুব।'

নবীন দত্ত উঠে ময়লা খদ্দরের পাঞ্জাবিটা পরে ফেললেন। পারুলবালা উঠে নেমে গেলেন। নবীন দত্ত স্যাণ্ডালটা পায়ে

দিতে গিয়ে দেখলেন একটা জুতোর স্ট্র্যাপ প্রায় ছিঁড়ে গেছে। তখনই মোটা ছুঁচ আর মোটা সুতো বার করে ছটো ফোঁড় দিয়ে নিলেন স্ট্র্যাপটাতে। রাস্তায় মুচি পেলে সারিয়ে নেবেন। টাকা পয়সার ছোট্ট থলিটি হাতে নিয়ে ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন নবীন দত্ত। কিন্তু চারতলায় তুমের ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন আবার। তুয়ারটা হাঁ হা করছে খোলা। কপাটটা বন্ধ পর্যন্ত করে যায় নি ছেলেটা। ঘরের ভিতর ঢুকলেন নবীন দত্ত। ঢুকেই দেখলেন ঘরে অসংখ্য সিগারেটের টুকরো। কোণে ক্যামেরাটা রয়েছে। মাটিতে একটা আড়-ময়লা চাদর ঢাকা বিছানা। বিছানায় এলোমেলো অনেক বই। ঘরের দেওয়ালেও বইয়ের শেল্ফ্। সব বই ঠাসা। বিজ্ঞানের বই। তিনি কিছু বোঝেন না। হঠাৎ যেন নজরে পড়ল একটা আলমারিতে কিছু আধুনিক ইংরেজি নাটক রয়েছে। পাশের ঘরে ছবির স্তূপ। চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন নবীন দত্ত। কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগলেন। আরও মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ করে। তারপর নেবে গেলেন।

রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড় এই তুপুরেও। ময়দানে কি একটা হচ্ছে না কি। পিলপিল করে লোক ছুটছে সেদিকে। কেউ কাউকে চেনে না, অথচ পাশাপাশি ছুটছে। নবীন দত্তকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেল এক গগলস পরা ছোকরা। হনহন করে চলেছে দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে। চাকরিহীন বেকার, পেটে বিদ্যে নেই, কিন্তু চালচলন দেখে মনে হয় এক একটি নবাব। নবীন দত্ত ভাবলেন এ আমাদেরই দোষ, আমরা ওদের গড়তে পারি নি,

শিব গড়তে বাঁদর গড়েছি। হঠাৎ একটি [illegible] দেখলেন। বয়স কত তা বোঝার উপায় নেই। মুখ দেখে মনে হয় তিরিশ পেরিয়ে গেছে। বব্ করা চুল, চোখে কাজল, পিঠের অনেক-খানি দেখা যাচ্ছে, কাপড়টা পরেছে নাভির অনেক নিচে, হাতে গয়না নেই, আছে শুধু একটা ঘড়ি। আর এক হাতে শিকলের মতো কি একটা জড়ানো। মুখে খুকী-খুকী ভাব। স্যাণ্ডাল টেনে টেনে চলেছে এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে। সে যুগ হলে এ জাতীয় চেহারাকে পতিতার পর্যায়ে অনায়াসে ফেলে দিতে পারতেন, কিন্তু এ যুগে তা যায় না। কারণ অধিকাংশেরই ওই বেশ। এ দেশের অধিকাংশই বেশ্যা হয়ে গেছে এ কথা ভাবতে পারলেন না নবীন দত্ত। মনে মনে রবীন্দ্রনাথের সেই লাইনটা আওড়ালেন—ও আমার, এ তোমার পাপ। তারপর তিনি আর কোনও দিকে না চেয়ে হনহন করে চলতে লাগলেন। যাচ্ছিলেন তিনি ধীরেশ বিশ্বাসের কাছে। লোকটি তাঁর পেনসন-উদ্ধারের ব্যাপারে খুব সাহায্য করেছে তাঁকে। তার একটি মেয়ে আছে, তাঁরই ছাত্রী, তার জন্যে খুব ভালো একটি পাত্রের খোঁজ পেয়েছেন তিনি। পাত্রের বাবার সঙ্গে আলাপ আছে নবীন দত্তের। কিন্তু তিনি থাকেন টালিগঞ্জে। তাঁর ফোন আছে, ধীরেশেরও আছে। ধীরেশের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে ফোন করবেন বলেই যাচ্ছিলেন। নবীন দত্ত যেতে যেতে ভাবছিলেন—ফোন তো করব, কিন্তু ভদ্রলোক আমার কথা কি শুনবেন। এদেশে সম্বন্ধ করে বিয়ের ব্যাপার আগেকার চেয়েও জটিল হয়ে গেছে। আগে কুরূপা মেয়েকে টাকা দিয়ে পার করা যেত। আজকাল কুরূপা মেয়েদের বিয়েই হয় না। হয়, যদি তারা নিজেরাই ফাঁদ পেতে

কাউকে ধরতে পারে। আমেরিকায় নাকি ছেলে-মেয়েরা date করে সম্মিলিত হয়, সম্মিলন-অভিসারে যাওয়ার আগে মায়েরা তাদের পিল খাইয়ে দেন যাতে তারা গর্ভবতী না হয়ে পড়ে। ও দেশের কুৎসিত সমাজ-চিত্র ওদেশের এক নাট্যকার টেনেসি উইলিয়াম্স্ লিখেছেন তাঁর 'এ ক্যাট অন এ হ্যাট টিন রুফ' নাটকটাতে। সেই সমাজের নকল করছি আমরা। ভদ্র মেয়েরা সিনেমায় ঢোকবার জন্যে উৎসুক, চাকরি করবার জন্যে 'কিউ' দিচ্ছে নানা অফিসের দরজায়, দেহও বিক্রি করছে অনেকে, আর তাদের দেহকে লক্ষ্য করে সাহিত্য-সৃষ্টি করছে মনে-মনে-লম্পট সাহিত্যিকের দল। অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিলেন নবীন দত্ত। হঠাৎ ফুটপাথের উপর হোঁচট খেলেন, তাঁর অমজবুত স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গেল। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলেন এক ছোকরার ঘাড়ে। সে সহানুভূতি দেখাল না। বলল—রাস্তা দেখে চলতে পারেন না মশাই। নবীন দত্ত মাপ চাইলেন তার কাছে। স্যাণ্ডাল দুটো খুলে হাতে নিলেন। হাতে নিয়েই পথ চলতে লাগলেন। চিৎপুরের সেই চেনা-মুচটার কাছে যাবেন, বরাবর তার কাছেই জুতো সারান। খালি পায়েই হাঁটতে লাগলেন। মুচিটি যেখানে বসে তার পাশেই একটি ডাক্তারবাবুর চেম্বার। তাঁর সঙ্গে তেমন আলাপ নেই নবীন দত্তের। আলাপ আছে তাঁর কম্পাউণ্ডারটির সঙ্গে। কম্পাউণ্ডারের ভাই তাঁর ছাত্র। ছেলেটি পড়াশোনায় তেমন ভালো নয়, কিন্তু রাজনীতিতে পরিপক্ক। উগ্র কমিউনিস্ট। সম্ভবত গরীব বলে। কিন্তু ছেলেটির মধ্যে একটি আন্তরিকতা লক্ষ্য করেছেন নবীন দত্ত, তাই তাকে ভালোবাসেন। প্রায়ই পড়া বলে দেন তাকে, বিনা পয়সায়। কম্পাউণ্ডারবাবু তাই খাতির

করেন তাঁকে।

'আসুন, আসুন মাস্টার মশাই।'

মুচিকে জুতো জোড়া দিয়ে ডিসপেন্সারিতে উঠে বসলেন নবীন দত্ত। মুচি জুতোটা উলটে পালটে দেখলে অনেকক্ষণ ধরে। তার-পর বললে—

'এ জুতো ফেলে দিন বাবু। এ আর চলবে না।'

'সে আমিও বুঝেছি। কিন্তু এখন জুতো কেনবার পয়সা নেই। আগে ন'সিকে আড়াই টাকা খরচ করলে চীনেবাজারে ভালো জুতো পাওয়া যেত। এখন কুড়ি বাইশ টাকার কমে কোনও জুতো পাওয়া যায় না। এটাই একটু মেরামত করে দাও বাবা তুমি- '

'একে রিসোল্ করতে হবে, স্ট্র্যাপ্ গুলোও নতুন দিতে হবে! মেরামতি খরচ পড়বে তিন টাকা—'

কম্পাউণ্ডারবাবু বললেন—'খরচ যা-ই পড়ুক। ওটা করে দাও তাড়াতাড়ি।'

নবীন দত্ত টাকার থলিটা বার করে দেখলেন তাঁর কাছে কত আছে। তিন টাকা আছে কি না। খুচরোই বেশী ছিল। গুনে গুনে দেখলেন তিন টাকা আশি নয়া আছে। নিশ্চিন্ত হলেন। আশি নয়ায় ধীরেশের বাড়ি গিয়ে পৌঁছতে পারবেন। তারপর ধীরেশের কাছ থেকে কিছু ধার করে বাড়ি ফিরবেন।

ধীরেশ বিশ্বাস রোগা ছিপছিপে লোক। বয়স প্রায় আশির কাছাকাছি। গোঁফ দাড়ি কামানো লম্বা গোছের মুখ। নাকটি খুব টিকালো। মাথায় চুল বেশী নেই, যা আছে তা শাদা।

সোজা-ভাবে আঁচড়ানো। কখনও তেড়ি কাটেন নি। দাঁত পড়ে নি এখনও। চোখের দৃষ্টিও ভালো আছে। পড়বার সময় কেবল তিনি চশমা ব্যবহার করেন। ব্রিটিশ আমলে উঁচু সরকারি কাজ করতেন। এখনও তাঁকে পরিচিত পুরাতন গভর্নমেণ্ট কর্মচারীরা খাতির করে। তাই তিনি নবীন দত্তের পেনসন আর প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের ব্যাপারে সাহায্য করতে পেরেছেন। আর একটা ব্যাপার, ধীরেশ বিশ্বাস নাস্তিক প্রকৃতির লোক। ঈশ্বরের প্রতিই শুধু নয়, সব মানুষের প্রতিও তাঁর যেন একটা অবিশ্বাসের ভাব। একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয় নবীন দত্ত। তিনি তার নামই দিয়েছেন এক্সেপশন্ (exception) দত্ত। তিনি কাউকে বিশ্বাস করেন না। বলেন, সবাই চোর, স্বার্থপর, মতলববাজ, তিনি কাউকে শ্রদ্ধা করেন না, বলেন শ্রদ্ধেয় কেউ নেই, সব ধড়িবাজ ভণ্ড। কিন্তু নবীন দত্তকে তিনি বিশ্বাস করেন, শ্রদ্ধাও করেন। এতদিন তাঁকে দেখছেন কোনদিন তার মধ্যে মেকি কিছু দেখতে পান নি। আন্তরিকতার অভাব দেখতে পান নি। এই লোকটির সত্যনিষ্ঠা মুগ্ধ করেছে তাঁকে। কখনও কথার খেলাপ করেন নি, সত্যকথা স্পষ্টভাষায় বলতে ভয় পান নি। মাঝে মাঝে বলেন—'এক্সেপ্শন্ দত্ত, তুমি বাঙালীর পোশাকে সায়েব একজন। সাহেবদের মধ্যেও খারাপ অনেক আছে, কিন্তু ভালো যারা আছে তারা পয়লা নম্বরের। তুমি সেই পয়লা নম্বরের লোক। কি করে এদেশে জন্মালে হে।'

নবীন দত্ত উত্তর দিয়েছিলেন, 'পয়লা নম্বরের সাহেবের উপমা দিলেন, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে ওটা অপমান। আমাদের দেশেও অনেক পয়লা নম্বরের লোক ছিলেন, এখনও আছেন,

যাঁরা প্রণম্য। তাঁদের পায়ের নখেরও যুগ্যি নই আমি। আমার স্বপক্ষে এইটুকু শুধু বলতে পারি আমি ভালো থাকবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সব সময়ে পারি নি। আর একটা অনুরোধ, আমার প্রশংসা কখনও আমার সামনে করবেন না। বড্ড অস্বস্তি লাগে।'

ধীরেশ বিশ্বাস বললেন, 'বেশ তোমার প্রশংসা করব না। কিন্তু তুমি যে বললে এখনও দেশে প্রণম্য লোক আছেন—একটা নাম কর দিকি—'

নবীন দত্ত একজনের নাম করলেন।

'ও এই তোমার প্রণম্য লোক? ও লোকটা 'রেড এরিয়া'য় রেগুলার যাতায়াত করে জান এ খবর? আমি পুলিসের লোক, অনেক প্রণম্য ব্যক্তির হাঁড়ির খবর রাখি।'

নবীন দত্ত একটা আশ্চর্য উত্তর দিয়েছিলেন তাকে।

বলেছিলেন—'তা সত্ত্বেও উনি প্রণম্য। যার বাড়িতে ভালো রান্না হয় না, অথচ যিনি খাদ্যরসিক, তিনি যদি হোটেলে নিজের পয়সা খরচ করে খান, তাতে আমি অন্যায় কিছু দেখি না। যে লোক-টির নাম করলাম তিনি একজন দিকপাল বিদ্বান তো বটেই, মানুষ হিসেবেও খুব বড়। অনেক গরীব ছাত্রকে পড়ান, অনেক দুঃস্থ আত্মীয়কে অর্থ সাহায্য করেন, পারতপক্ষে বিদেশী জিনিস কেনেন না, কারো খোশামোদ করেন না, তার প্রকাণ্ড বাড়ির একতলাটা বিনা পয়সায় ছেড়ে দিয়েছেন নাইট স্কুল করবার জন্যে। তাঁর স্ত্রী বিয়ে হবার এক বছর পরেই মারা যান। ছেলে-পিলে নেই। তবু বিয়ে করেন নি। আর একটা প্রধান গুণ যা আজকাল প্রায় বিরল হয়ে এসেছে আত্মপ্রচার উনি করেন না

কখনও। সেজন্য অনেক লোক তাঁর নামও জানে না।'

ধীরেশবাবু হেসে জবাব দিয়েছিলেন—'সবই মানলুম। কিন্তু ওই 'রেড এরিয়া'র কথাটা কিছুতে ভুলতে পারি না। এক কলসী দুধে চোনা পড়ে গেছে খানিকটা। আমার কাছে মনুষ্যত্বের প্রধান লক্ষণ চরিত্রবল। আমি পঞ্চান্ন বছর বয়সে বিয়ে করে-ছিলাম। তার কারণ আমার ভাইদের মানুষ করতে হয়েছিল, বোনদের বিয়ে দিতে হয়েছিল। তাই যৌবনে বিয়ে করবার অবসর পাই নি, কিন্তু তা বলে বিপথে যাই নি একদিনও। যাওয়ার সুযোগ ছিল, পুলিসে চাকরি করতাম। আমাদের ওপরওলা টেগার্ট সাহেবও যেতেন একটি মেয়ের কাছে। সেজন্য ঘৃণা করতাম তাকে। বিয়ের পরও বউ আমার বাঁচল না। ওই একটি মেয়ে প্রসব করে মারা গেল। ওই মেয়েটিকেই আগলাচ্ছি এখন। আর বিয়েও করি নি রেড এরিয়াতেও যাই নি—'

এসব আলোচনা অনেক দিন আগে হয়েছিল।

নবীন দত্ত প্রথমে ছিলেন শিশুর মাস্টার মশাই, পরে হয়েছিলেন কাকাবাবু। শিশু এখন শিশু নেই, এম. এ. পাস করেছে, ডক্ট-রেট পেয়েছে, বয়স প্রায় তিরিশের কাছাকাছি। এখন ধীরেশ বিশ্বাসের মহাচিন্তা শিশুর বিয়ে নিয়ে। আসলে তিনি চান না যে শিশু বিয়ে করে অন্য কোথাও চলে যাক। এ-ও চান না কোন ছোকরা তাঁর বাড়িতে এসে ঘর-জামাই হয়ে থাকে। শিশু অন্য কোথাও চাকরি করুক, সকাল দশটা হতে না হতেই নাকে মুখে যাহোক চারটি গুঁজে সন্ধ্যা পর্যন্ত আপিস করুক—এটাও তাঁর মনঃপূত নয়। তিনি চান শিশু সারা দিনরাত তাঁর কাছেই ঘুরঘুর করুক, তাঁকে বকুক, তাঁর নানা অপটুতার বন্যায় পটুতার

বাঁধ হয়ে হামে-হাল দাঁড়িয়ে থাকুক। কিন্তু ধীরেশ বিশ্বাস এসব কথা কাউকে বলতে সাহস করেন না! তাঁর সব চেয়ে ভয় নবীন দত্তকে। নবীন দত্ত অনেক দিন থেকেই বলছেন—শিশুর এবার বিয়ে দেওয়া দরকার। ধীরেশ বিশ্বাসও বলেছেন, হ্যাঁ, দেখ না একটা ভালো ছেলে। ভালো ছেলের অনেক সন্ধান এনেছেন নবীন। কিন্তু ধীরেশ একটা না একটা খুঁত বার করে নাকচ করে দিয়েছেন তাদের। কেউ বেঁটে, কেউ বেশী লম্বা, কেউ খুব গরীব, কেউ বেশী বড়লোক, কারও মায়ের হাঁপানি, কারো ঠাকুর্দা যক্ষ্মায় মারা গিয়েছিলেন, কেউ বেশী স্নব, কারো ইচ্ছে জার্মানি, ইংলণ্ড বা আমেরিকায় গিয়ে বসবাস করবে—এই ধরনের নানা অজুহাতে ধীরেশ একের পর এক অনেক ভালো পাত্রকে অমনোনীত করেছেন। তাঁর পক্ষে খুঁত বার করা সহজ, কারণ গভর্নমেন্টের পুলিস বিভাগের (বিশেষ করে আই. বির) অনেকের সঙ্গে তাঁর আলাপ। পাত্রের খবর পেলেই তাদের লাগিয়ে দেন। তারা একটা না একটা খুঁতের খবর এনে হাজির করেন। নবীন দত্তও কিন্তু না-ছোড়। তিনি একের পর এক পাত্রের খবর এনে যাচ্ছেন। সৎপাত্রের খবর পেলেই তিনি তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন। কথাবার্তা কয়ে তাঁর যদি ভালো লাগে তাহলে তিনি প্রথমে শিশুকে জিগ্যেস করেন— এই পাত্র তোর পছন্দ হবে? শিশুর বরাবর এক উত্তর—আপনারা যা ঠিক করবেন তাই হবে। কেবল আমার একটি শর্ত—বিয়ের পরও আমি লেখাপড়া করব। নবীন দত্তরও তাই মত। তখন তিনি পাত্রের খবর ধীরেশকে বলেন। ধীরেশ মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন —দাঁড়াও, আগে খবর-টবর নি। তারপর বলব। এর পর তিনি

খবরটি তাঁর ঘনিষ্ঠ পুলিস বন্ধুদের কাছে চালান করে দিয়ে বলেন —খুঁত বার কর।

এবার নবীন দত্ত যে পাত্রটির খবর এনেছিলেন সেটি প্রায় নিখুঁত। ধীরেশবাবুর চরেরা সবাই এসে বলেছিলেন—না, ভালো পাত্র। বংশ ভালো। ওদের পরিবারের কারও বিরুদ্ধে খারাপ কোন খবর নেই। সবাই একবাক্যে প্রশংসা করল ওদের। পাত্রটি ভালো। তবে রং ফরসা নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। মাথার সামনেব দিকে একটু টাকও আছে। তাঁদের মতে পাত্রটি সুপাত্র, টাক বা রঙে কিছু আসে যায় না। খবরটি সংগ্রহ করে গুম হয়ে বসে আছেন ধীরেশ বিশ্বাস। নবীন দত্ত খবর পাঠিয়েছে আজই সে এসে ফোন করবে পাত্রপক্ষকে। সশঙ্কিত হয়ে বসে-ছিলেন ধীরেশ বিশ্বাস। একটু পরেই ধীরেশবাবু বিস্মিত হলেন। যা কোনও দিন হয় না, তাই আজ ঘটল। নবীন দত্ত এলেন রিক্শা করে। মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। রিক্শা থেকে নেমেই বললেন—'রিকশ'র ভাড়াটা মিটিয়ে দিন। আমার কাছে পয়সা নেই।'

'মাথায় কি হয়েছে—'

'ক্রিকেটের বল লেগেছে। ছেলেরা রাস্তা ব্লক করে ক্রিকেট খেলছে দুপুর বেলা। আমার মাথায় লেগে গেল হঠাৎ। একটা ছেলে বলল—দেখছেন না খেলা হচ্ছে, এদিক দিয়ে আসছেন কেন মশাই। এমনভাবে বললে যেন রাস্তাটা তার বাবার। কিছু বললাম না, পার হয়ে গেলাম সেখানটা। তারপর একজন ভদ্রলোক বললেন, আপনার মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে যে। তখন দেখলাম, আমার জামাতেও রক্ত পড়েছে।' 'একটু গিয়েই

মিত্তিরদের ডিসপেন্‌সারি আছে সেখানে গিয়ে ওষুধ লাগিয়ে নিন”—এই উপদেশটি দিয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন। মিত্তিরদের ডিসপেনসারির যিনি কম্পাউণ্ডার ছিলেন তিনি তোতলা। তো তো করে বললেন যে ওষুধ ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদির দাম দেড় টাকা পড়বে। দেড় টাকা ছিল না, তাই ট্রামে করে মেডিকেল কলেজে গেলাম। সেখান থেকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়ে আসছি। ফেরবার সময় কিছুদূর ট্রামে এলাম। তারপর ট্রাম ফুরিয়ে গেল। নেমে ভাবলাম ‘বাস’ ধরি। কিন্তু কিছুদূর হেঁটেই মাথা ঘুরে উঠল। তাই রিক্‌শা করেই চলে এলাম। ফোনে আজ কথাটা শেষ করে ফেলতে চাই। তাঁদের চিঠিও লিখেছি যে আজ তাঁদের ফোন করব। তাঁরা হয়তো আমার ফোনের অপেক্ষা করবেন। তুমি পাত্রটির সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছ?’

‘নিয়েছি। রিপোর্ট তো ভালই। কিন্তু শুনছি রং কালো আর মাথায় টাক।

‘শিশুকে বলেছ?’

‘না।’

‘বল। সেই ঠিক করুক এ পাত্র সে পছন্দ করবে কি না। কন্যা বরয়তে রূপং—’

ধীরেশের ডাকে শিশু নেমে এল নীচে।

আসতেই নবীন দত্ত বললেন—‘ওগো শিশুসমা, আমরা একটি ভালো পাত্র পেয়েছি। শোনা যাচ্ছে তার রং কালো আর টাক আছে। তোমার যদি আপত্তি থাকে—’

শিশুকে শিশুসমা নবীন দত্তই করেছেন। বলেছিলেন, ওর নাম-টার মধ্যে কায়দা করে সুষমা ঢুকিয়ে দিলাম।

শিশু এসে বললে—'কাকাবাবু, ওঘরে চলুন। সব বলব। শরবৎ খাবেন ?'

'খেতে পারি—'

পাশের ঘরে গিয়ে শিশু বললে—'কাকাবাবু, আমার বিয়ের জন্য চেষ্টা করবেন না।'

'কেন—'

বাবার ইচ্ছে নেই। বাবা চান না আমি তাঁকে ছেড়ে কোথাও যাই। অথচ তিনি আপনার কথাও ঠেলতে পারছেন না। নানারকম খুঁত বার করেছেন তাই। আমি বিয়ে নাই করলাম। আমিই তো বাবার একমাত্র অবলম্বন। আমি চলে গেলে সত্যি ওঁর কষ্ট হবে খুব। আমি বিয়ে করব না। আপনি ফোনে ওদের বলে দিন ছেলের মাথায় টাক আছে বলে ও পাত্র পছন্দ নয় আমাদের।'

'তুই ঠিক থাকতে পারবি ?'

'পারব একথা জোর করে বলা যায় কি। চেষ্টা করব। এমন কিছু করব না যাতে আপনাদের মনে কষ্ট হয়।'

'আমাদের মনের কষ্টের কথা ভাবছ কেন তুমি। আমাদের মনে কষ্ট হবে বলে কোনও ভালো কাজও তুমি করবে না ? তাহলে তো মুশকিল। এই যে ভুম হঠাৎ জার্মানি চলে গেল, আমার মনে কষ্ট হয়েছে, তার মায়ের মনেও হয়েছে। তাহলে কি ভুমের মায়ের আঁচল ধরে বসে থাকা উচিত ছিল ? ছিল না। সে ঠিক কাজই করেছে। আমাদের কথা তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমি নজে যা ভালো বোঝ তাই কর। তুমি লেখাপড়া শিখেছ। তোমার যদি মনে হয় বাবার জন্যে এখন তুমি বিয়ে করবে না, বেশ তো,

করো না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি দেখি তুমি গালে চুন-কালি মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছ তাহলে তোমার সঙ্গে সংস্রব রাখা শক্ত হবে আমার পক্ষে। তুমি যদি চুনকালি মাখাটা ভালো মনে করো মেখো, আমাদের মনোকষ্ট হবে কি না এ নিয়ে মাথা ঘামিও না, তুমি লেখাপড়া শিখেছ, প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছ, তোমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার প্রবৃত্তি আমার নেই, তবে আমাদের স্বাধীনতাতেও হস্তক্ষেপ করতে পাবে না তুমি।'

শিশু হাসিমুখে চেয়েছিল নবীন দত্তের দিকে।

'কি স্বাধীনতা।'

'তোমার সংস্রব ত্যাগ করবার স্বাধীনতা—'

'ইস্ তা কি পারবেন? পারলে করবেন!'

শিশু ঠোঁট ফুলিয়ে চলে যাচ্ছিল, নবীন দত্ত ডাকলেন আবার:

'শোন--শোন—'

'কি?'

'আমাকে এত দুর্বল বলে মনে করিস তুই? বেশ, এখনি আমি চললাম আর আসব না এ বাড়িতে।'

নবীন দত্ত বেরিয়ে যেতে উদ্যত হতেই শিশু বলে উঠল 'কি যে অবুঝের মতো আপনি করেন কাকাবাবু। আপনি শরবৎ খেতে চেয়েছিলেন আগে সেইটে খান। তার পর বলুন, আপনার মাথায় ব্যাণ্ডেজ কেন—'

'একটা বল লেগেছিল রাস্তায়। ছেলেরা খেলছিল।'

'কি পাজী সব ছেলেরা হয়েছে আজকাল। রাস্তায় বল খেলবে?'

'পাজী ছেলেরা নয়, পাজী আমরা। গণ্ডা গণ্ডা ছেলের জন্ম দিয়েছি, অথচ তাদের ঘরে থাকবার জায়গা নেই, খেলবার মাঠ নেই,

রাস্তায় রাস্তায় দলে দলে কুকুর বেড়ালের মতো ঘুরছে আর হুড়োহুড়ি করছে। কী করবে, কোথায় যাবে ওরা—'

'খুব লাগে নি তো—'

'অজ্ঞান হই নি যখন, তখন গুরুতর কিছু নয়।'

'আপনি ভিতরে চলুন। শরবৎ খেয়ে তবে যাবেন।'

'আর ও ভদ্দরলোকদের ফোনও করতে হবে। টাকের কথা বলব না, সরল সত্য কথাই বলব। বলব আমি আগে জানতাম না যে মেয়ের বাপের ইচ্ছেই নেই মেয়ের বিয়ে দেবার। সেইজন্যে চেষ্টা করছিলাম, আমাকে মাপ করবেন।'

শিশু বললে—'ফোনটা আপনি করবেন কেন? আমিই করি—'

'তুমি? কেন?'

'আপনি তো ঘুর-পথে যেতে পারবেন না। আমি বলব ছেলের কুষ্ঠি পাঠান, মেয়ের কুষ্ঠির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে—'

শিশু মুচকি হেসে চেয়ে রইল নবীন দত্তের দিকে। হাসলে তার গালে টোল পড়ে।

'স্টুপিড্ কোথাকার'

শিশু এক ছুটে ভিতরে চলে গেল।

তার পিছনে নবীন দত্তও গেলেন। কিন্তু শিশুর নাগাল পেলেন না। শিশু রোগা ছিপছিপে, তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। নবীন দত্তকে ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভাঙতে হল। তেতলায় উঠে দেখেন ধীরেন বিশ্বাস একা গুম্ হয়ে বসে আছেন। শিশু নেই। বিশ্বাস মশাই নবীন দত্তকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু কিছু বলবার আগেই নবীন দত্ত বললেন—'আপনি মেয়ের বিয়ে দিতে চান না এ কথাটা আমাকে আগে খুলে বললেই

পারতেন। আমার এত হায়রানি হত না।' সামনে যে মোড়াটা ছিল সেইটেতেই বসে পড়লেন নবীন দত্ত। ধীরেশ তবুও গুম্।

নবীন দত্ত বললেন—'আপনি যে এতটা স্বার্থপর তা ধারণা ছিল না। নিজের সুখের জন্যে মেয়েকে নিজের কাছে রেখে দেবেন চিরকাল—এ তো ভাবাই যায় না—'

ধীরেশ বিশ্বাস বললেন—'আজকাল ছেলেদের যে রকম মতি-গতি দেখছি, একজন পুলিস অফিসার হিসাবে আমার যা অভিজ্ঞতা, তাতে আমি বুঝেছি মেয়েকে কারো সঙ্গে বিয়ে দেওয়া মানেই তার হাত-পা বেঁধে একটা অনিশ্চিত গহ্বরের মধ্যে ছুঁড়ে দেওয়া। সে গহ্বরে সাপ বিছে বাঘ ভাল্লুক দৈত্য দানব পাঁক আগুন সব কিছু থাকাই সম্ভব। তাছাড়া দিলেই ছেলে হবে, এক একটা ছেলে হওয়ার কি ভয়ঙ্কর 'রিস্ক' তা জানেন?'

নবীন দত্ত ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়েছিলেন ধীরেশবাবুর দিকে। তিনি যেন ধীরেশ বিশ্বাসকে নূতন করে আবিষ্কার করছিলেন। তাঁর প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না তিনি, চুপ করেই রইলেন।

ধীরেশবাবু কাতর ভাবে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন—'তাছাড়া এই বুড়ো বয়সে, আমি কার কাছে থাকি বলুন।'

'বেশ মেয়ের কাছেই থাকুন। আমার ধারণা ছিল অন্য রকম। আমি জানি মেয়ে হলে তাকে সৎপাত্রে অর্পণ করাই কর্তব্য। আমারও দুটি মেয়ে আছে, তাদেরও আমি কম ভালোবাসতুম না, কিন্তু তাদের নিজের সেবার জন্যে কাছে রাখি নি, বিয়ে দিয়েছি, তার জন্যে বাড়ি বাঁধা দিতে হয়েছে আমাকে, তবু দিয়েছি। কিন্তু আপনার মত দেখছি অন্য রকম। এখন সমাজ বলে কিছু নেই, টাকাই সমাজ, টাকাই ভগবান, যে যা খুশী

করছে। আপনিও করুন। আপনার ফোনটা কোথা। সেই ভদ্র-লোকদের ফোন করে দি···তারপর চলে যাই।'

শিশু এক গ্লাস শরবৎ নিয়ে ঢুকল।

'আপনার এখন যাওয়া হবে না কাকাবাবু। আমি ডাক্তার সেনকে ফোন করেছি। তিনি এসে আগে আপনার মাথার চোটটা দেখুন। এইখানেই খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি আপনার।'

'আমি খেয়ে এসেছি—'

'তাহলে শরবৎটা খেয়ে ওঘরে বিশ্রাম করবেন চলুন। ডাক্তার সেন আপনাকে দেখে যান, তারপর আমি আপনাকে ট্যাক্সি করে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

'আমার কিচ্ছু হয় নি।'

'ডাক্তার সেন এসে দেখে যান না। যদি কোনও ওষুধ বা ইন্-জেক্‌শন দেন—'

'কি বিপদ, আমার কিচ্ছু হয় নি, কেন জ্বালাচ্ছিস আমাকে—'

শিশু মুচকি হেসে তাঁর দিকে চেয়ে রইল।

গালে টোল পড়ল।

'শরবৎটা খেয়ে ফেলুন।'

শিশু আসার সঙ্গে সঙ্গে ধীরেশ বিশ্বাস পাশের ঘরে চলে গিয়ে-ছিলেন। নবীন দত্ত খেয়ে জামার হাতায় মুখটা মুছে ফেললেন।

'চল এবার ফোনটা করে ফেলি। সে ভদ্রলোকরা আমার ফোনের জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'চলুন। কিন্তু বাবার দোষ দেবেন না। বরং বলুন মেয়েটি বিয়ে করতে চাইছে না।'

নবীন দত্ত

ঘণ্টা তিনেক পরে নবীন দত্তের সঙ্গে শিশু নেবে এল দোতলা থেকে।

'তুমি নাবলে কেন ---'

'আমি আপনাকে ট্যাক্সি করে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'কি দরকার! আমি ট্রামে বাসে চড়তেই অভ্যস্ত, বেশ চলে যাব।'

'না, আমি আপনাকে একলা যেতে দেব না। এই ট্যাক্সি- -'

ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল একটা।

'উঠুন- '

ট্যাক্সির কপাটটা খুলে দাঁড়িয়ে রইল। উঠতে হল নবীন দত্তকে। তারপর শিশুও উঠল।

ট্যাক্সিতে উঠে শিশুর দিকে চেয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে নবীন দত্ত বললেন- 'আমার উপর এমন জবরদস্তি করিস কেন বল্ তো—'

শিশু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে রইল, কোন উত্তর দিল না।

'কি রে কথার কোনও জবাব দিচ্ছিস না।'

শিশু তবু মুখ ফিরিয়ে রইল।

নবীন দত্ত জোর করে তার মুখটা নিজের দিকে ফিরিয়ে নিলেন। শিশু মুচকি হাসল। তার গালে টোল পড়ল, কিন্তু নবীন দত্ত দেখলেন তার দুই চোখে জল টলমল করছে।

'এ কি কাণ্ড।'

শিশু কোনও জবাব দিলে না। ট্যাক্সি ছুটতে লাগল। সমস্ত পথটা শিশু কোন কথাই বলল না। নবীন দত্তও চুপ করে রইলেন। নবীন দত্তকে বাড়িতে নামিয়ে কিন্তু শিশু কথা কইল।

'আমি এই ট্যাক্সিতেই ফিরে যাচ্ছি।'
নবীন দত্তকে প্রণাম করে সে ট্যাক্সিতে উঠে বসল। নবীন দত্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, একটা কথাই বারবার তাঁর মনে জাগতে লাগল—ওর চোখে জল কেন।

২

রাখাল এসেছিল।

সঙ্গে ছিল এক তাড়া প্রুফ আর বগলে একটা হিসাবের খাতা আর ফ্ল্যাট ফাইল একটা।

'ওগুলো কি ফাইনাল প্রুফ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ফোর্থ প্রুফ'।

নবীন দত্ত প্রথম পাতাতেই তিনটে বানান ভুল বার করলেন।

'এ তো ভুলে ভরতি দেখছি। কে প্রুফ দেখেছে?'

'প্রেসের লোকেরা—'

'প্রেসের প্রুফ রীডাররা সাধারনত মূর্খ হয়। ভাষা-জ্ঞান না থাকলে ভালো প্রুফ দেখা যায় না। তোমরা দেখে দাও নি

কেন ?'

'বিকাশ তো পেটের অসুখে ভুগছে। আর আমাকে নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই—'

'ওই লোকটিকে চেন ?'

বিদ্যাসাগরের ছবিটি দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'বিদ্যাসাগর। ও ছবি কে না চেনে।'

'উনি তোমার চেয়ে বেশী কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তবু নিজের বইয়ের প্রুফ নিজে দেখতেন।'

রাখাল নীরব হয়ে রইল।

নবীন দত্ত বললেন—'স্কুল কলেজ পাঠ্য বই নির্ভুল ছাপা হবে। তা না হলে ছেলেরা ভুল শিখবে। তুমি নিজে আর একবার প্রুফটা দেখো। তারপর আমি আবার দেখব।'

প্রুফটা ফেলে দিলেন নবীন দত্ত।

'দেখি হিসেবের খাতাটা দেখি—'

হিসেবের খাতা দেখে বললেন—'এই যে কাগজ কিনেছ, কি ধরনের কাগজ তা তো লেখ নি। খালি লিখেছ কাগজ এত টাকা। নগদ দাম দিয়ে কিনেছ তো ?'

'হ্যাঁ।'

'দেখাও সেটা।'

রাখাল ফাইলটা খুলে দেখাল।

'এতেও তো লেখা আছে শুধু 'পেপার'। কি পেপার তা তো লেখে নি'—রাখাল চুপ করে রইল।

'কোন্ দোকান থেকে কিনেছিলে ? এ ক্যাশমেমোতে তো দোকানের নাম ছাপা নেই দেখছি—'

নবীন দত্ত

'ওটা ব্ল্যাক থেকে কিনেছি—'

'কেন ? খোলা থেকেই কিনতে হবে। আমরা চোরদের শরিক হব কেন ?'

চুপ করে রইল রাখাল।

গলার সুর চড়িয়ে নবীন দত্ত আবার প্রশ্ন করলেন—'আমরা কি চোর ?'

'না, চোর নই। কিন্তু খোলা বাজারে কাগজ নেই, দেরিতে বই বেরুলে বই কেউ কিনবে না।'

'না কিনুক। আমরা লাভ খুব বেশী রাখব না। পনেরো পারসেণ্ট লাভ হলেই খুশী হব আমরা। চোর প্রকাশকদের দলে ভিড়তে চাই না আমি। বুঝলে ?'

'বুঝেছি স্যার। চোরের দলে আমাদেরও ভিড়বার ইচ্ছে নেই। কিন্তু কি করি তাহলে যে ব্যবসা চালানো যায় না।'

'নিশ্চয় যায়। বিদ্যাসাগর চালিয়েছিলেন কি করে ? বিদ্যাসাগরের জীবনীটা আর একবার পড়—'

নবীন দত্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হিসাব দেখতে লাগলেন। রাখাল বসে উসখুস করতে লাগল। তার সিগারেট খাওয়া অভ্যাস। কিন্তু এখানে খাওয়া সম্ভব নয়।

'আপনি দেখুন, আমি একটু ঘুরে আসছি স্যার।'

'কোথায় আবার ঘুরতে যাবে এখন !'

'একটু চা খেয়ে আসি গলির দোকানটা থেকে।'

'সকালে খাও নি ?'

'খেয়েছি—'

'তবে আবার কেন ?'

'সকালে চা ছাড়া তো আর কিছু খাই না। তাই খিদে পেয়ে যায়।'

'ছোলা-ভিজে খাও না কেন? গুড় আর ছোলা-ভিজে?'

'দুটোই আজকাল অগ্নিমূল্য।'

আবার ধমকে উঠলেন নবীন দত্ত।

'অগ্নিমূল্য হলেও খেতে হবে। না খেলে বাঁচবে কী করে? এই যে টেরিলিনের শার্টটা পরে এসেছ এটার দাম কত?'

'এটাও বেশ দামী। কিন্তু একবার কিনলে অনেক দিন চলে। আর ধোপার খরচ লাগে না, একবার সাবান দিয়ে—'

'শুধু গায়ে থাকলেই বা ক্ষতি কি। না-খেয়ে দামী জামা গায়ে দেওয়ার কোন মানে হয় না।'

বিপদে পড়ে গেল রাখাল।

হঠাৎ উঠে পড়লেন নবীন দত্ত।

'আমার ভাঁড়ারে তো কিছু নেই। দেখি আমার গিন্নীর ভাঁড়ারে কিছু আছে কি না। থাকবার কথা নয়। আজকাল বড্ড গরীব হয়ে পড়েছি আমরা।'

উঠে নেমে গেলেন নিচে। রাখাল ছাতে দাঁড়িয়ে সিগারেটের বাক্স থেকে আধখানা সিগারেট বার করে চট্ করে ধরিয়ে ফেললে সেটা। সে আজকাল পুরো সিগারেট খায় না, আধখানা খায়। সিগাবেটও অগ্নিমূল্য। যখন ঠোঁট পুড়তে থাকে তখন ফেলে দেয় সেটাকে। ফেলত না, অনেকগুলো টুকরো থেকে সিগারেট বানাতে পারত যদি ভালো সিগারেট পেপার পাওয়া যেত। কিন্তু ভালো সিগারেট পেপার আজকাল পাওয়া যায় না, যা পাওয়া যায় তা অগ্নিমূল্য। সবই অগ্নিমূল্য। দেশকে যদি সীতার

সঙ্গে উপমা দেওয়া যায় তাহলে বলতে হয় রাবণের পরাধীনতা থেকে উদ্ধার করে তাঁর অগ্নিপরীক্ষা করা হচ্ছে। এইবার বোধ হয় তিনি পাতাল-প্রবেশ করবেন। এই সব কথা মাঝে মাঝে মনে হয় রাখালের। রাখাল একটু কবি-প্রকৃতির। সাহিত্যের ভালো ছাত্র সে। হঠাৎ তার ভয় হল—স্যার এসে যদি সিগা-রেটের গন্ধ পান! একটু পরেই নবীন দত্ত এলেন। কিন্তু সিগা-রেটের গন্ধের কথা উল্লেখ করলেন না। বললেন 'গিন্নী, তোমার জন্যে হালুয়া তৈরি করছেন। খেয়ে যেও। ভালো হবে না। কারণ, ভালো সুজি, চিনি. ঘি সবই দুর্লভ। তবু যা হচ্ছে খেয়ে যাও। আর একটা কথা শুনে রাখ। আগে ভালো খাবার, তারপর যদি পয়সা বাড়তি থাকে, তাহলে পোশাক। জমকালো শৌখীন পোশাক না হলেও চলে। তালতলার চটি আর শাদা উড়ুনি পরে বিদ্যাসাগর একদিন বাংলাদেশকে জাগিয়েছিলেন। নেকেড্ ফকির মহাত্মা গান্ধী জগৎ মাতিয়েছিলেন। এসব আদর্শ তোমরা ভুলে যেও না। প্রুফগুলো আর একবার দেখব। হিসেবের খাতাও তোমাদের ঠিক নেই। যাদের টাকা দিয়েছ তাদের নাম থাকলেই শুধু চলবে না। ঠিকানাও চাই। কুলি ও ঠেলা-ওয়ালা সবার নামও লিখে রাখবে। সম্ভব হলে ঠিকানাও। তোমার এ হিসাবের খাতা বিশ্বাসযোগ্য খাতা হয় নি। যা হয়েছে তা-তো আর সংশোধন করবার উপায় নেই। এবার থেকে যা যা বললাম তুমি তাই কোরো। আর ব্ল্যাক থেকে কিছু কিনো না, তাতে আমাদের ব্যবসা থাক বা যাক কিছু এসে যায় না। ভালো বই সত্যি যদি বার করতে পার ব্যবসা চলবে। ভালো ইংরেজি বই অনেক টাকা দাম দাম দিয়েও আমরা কিনি। খেলো বই শস্তা

হলেও কিনি না। ভালো ইংরেজী প্রকাশকরা বাজে বই বার করেন না। ফিচলেমি ছ্যাঁচোমিও করেন না, তাই তাঁদের ব্যবসা বিশ্বব্যাপী।—'

আরও কিছু উপদেশ হয়তো দিতেন, কিন্তু হল না। পারুলবালা একটা ডিসে হালুয়া নিয়ে উপস্থিত হলেন। 'খাও বাবা, ভালো হালুয়া আজকাল আর করাই যায় না। জিনিসপত্র পাওয়া যায় না। খাও—'

রাখাল খেয়ে দেখল অপরূপ হয়েছে হালুয়া। মনে পড়ল তারা যখন পাটনায় থাকত তখন মা এই রকম হালুয়া করতেন। পাটনা থেকে অনেক দিন চলে এসেছে তারা, মা-ও মারা গেছেন অনেকদিন। এই হালুয়া তাকে অনেক দূর নিয়ে গেল নিমেষের মধ্যে।

বলল—'বাঃ অপরূপ! অনেক দিন আগে মায়ের হাতে এই রকম হালুয়া খেয়েছি—'

রাখাল তাড়াতাড়ি উঠে এঁটো হাতেই প্রণাম করলে পারুলবালাকে।

পারুলবালা সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে রইলেন এক ধারে। তারপর সসঙ্কোচেই বললেন—'বেঁচে থাকো বাবা। দেশের মুখোজ্জ্বল কর।'

নবীন দত্ত হেসে বললেন—'তা পারবে কি না সন্দেহ আছে। চোরাবাজারীদের সঙ্গে এর মধ্যেই মেলামেশা আরম্ভ করেছে।' তারপর ধমকের সুরে বলে উঠলেন—'ফের যদি দেখি তুমি কালোবাজারে কাগজ কিনেছ তাহলে আমি আর তোমাদের সংস্রবে থাকব না—'

'আর কিনব না সার।'

প্রণাম করে কাগজপত্র গুটিয়ে রাখাল চলে গেল। তার মনে হতে লাগল আজ সে এমন একটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল যা এককালে মোটেই অসাধারণ ছিল না, কিন্তু যা আজকাল দুর্লভ। হ্যাঁ, সেকেলে বাঙালী বাড়ি আজকাল সত্যিই দুর্লভ। আজকাল খুব কম বাড়িতেই স্নেহময়ী মা দেখা যায়। আজকাল ঘরে ঘরে সমাজ-সেবিকা, বড় লেখিকা, বড় কংগ্রেসকর্মিণী, দেশবিখ্যাত নেত্রী, বড় অভিনেত্রী, এ সবই আছে—সেকালের স্নেহময়ী মা নেই। যা আছে, তা মুখোশ-পরা, তাদের হাব-ভাব, নিতান্তই লোকদেখানো। মাতৃহীন রাখাল অনেকদিন পরে পারুল বালাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

পারুলবালা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তাকে জিগ্যেস করলেন– 'আজও দুমের কোন চিঠি-পত্র আসে নি ?'

'না। এখনও আসে নি তো। পিওনের আসবার সময় অবশ্য এখনও যায় নি।'

তবুও দাঁড়িয়ে রইলেন পারুলবালা।

নবীন দত্ত বললেন—'তুমি অত ভাবছ কেন ?'

'সাধ করে কি আর ভাবছি ! ভাবনা হয়, কি করব। সেই গিয়ে একবার পৌঁছ-সংবাদ দিয়েছে, আর চিঠি লেখে নি দু'মাস হয়ে গেল।'

'আমি তো জানি সব'—একটু ঝাঁঝালো স্বরেই উত্তর দিলেন নবীন দত্ত। 'কিন্তু আমিও তো নিরুপায়। দুশো বার উঠ-বোস্ করলে এখনি যদি তার চিঠি এসে যেত তা হলে প্রাণ তুচ্ছ

করেও আমি তা-ও করতাম। কিন্তু তাতে তো কিছু হবে না। বৃথা আমাকে বলছ কেন? ছেলে যখন সাবালক হয়েছে, নিজে রোজগার করতে শিখেছে, নিজের ভালোমন্দ বুঝতে শিখেছে তাকে আঁচলে বেঁধে রাখবার চেষ্টা কোরো না। করলে নিজেই দুঃখ পাবে, আর কারো কিছু হবে না। ছেলেমেয়ে বড় হলেই নাগালের বাইরে চলে যায়। এটা মেনে নাও।'

'তোমার চিন্তা হচ্ছে না?'

'হচ্ছে বই কি। আমি তো পাষাণ নই। কিন্তু তোমার মতো দিনরাত মুখ-গোমড়া করে আমি বেড়াচ্ছি কি?'

পারুলবালা আবার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন 'বড় বৌমা কাল এক জায়গায় ইণ্টারভিউ দিতে গিয়েছিল। তোমাকে বলেছিল কি?'—ভ্রুকুঞ্চিত করে চুপ করে রইলেন নবীন দত্ত। পারুলবালা বললো, 'বৌমার এক কলেজের মাস্টার নাকি ওকে একটা ভালো চাকরি দিতে পারেন। দরখাস্ত করতে বলেছিলেন। কাল ইণ্টারভিউ দিয়ে এসেছে। তোমাকে বলে নি কিছু?'

'না। চাকরি করতে চাইছে কেন। আমি তো ওর জন্যে টিউশনি করছি—'

'ও বলছিল বাবা বুড়ো বয়সে আমাদের জন্যে এত পরিশ্রম করবেন সেটা আমার ভালো লাগছে না। আমি আবার চাকরিই করবো।'

'তাতো করবে। কিন্তু ওর রূপকে লুকুবে কি করে? রূপসী দেখে বউ করেছিলে, সেই রূপই যে এখন অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে ওর। রাস্তায় বেরুবার উপায় নেই। একদল ছোঁড়া পিছু

নেবে। উফ্, দেশটা দেখতে দেখতে কত নেবে গেল ! এই দেশে বিদ্যাসাগর বিবেকানন্দ জন্মেছিল, বিশ্বাস হয় ?'

পারুলবালা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন '—এ চাকরিটা যদি হয়, হেঁটে আপিস যেতে হবে না। মোটর এসে নিয়ে যাবে, মোটরে পৌঁছে দিয়ে যাবে।'

'তাই নাকি !'

ভ্রূকুঞ্চিত করে নবীন দত্ত নীরব হয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

'কোন্ আপিসে চাকরি ?'

'তা জানি না। তবে ওর প্রফেসারটির নাম জানি। খগেশ্বর হাজরা।'

'ও, খগেশ্বর ? সে তো অলঙ্কারের সঙ্গে পড়ত। খুব ভালো ছেলে ছিল। বিলেতের বড় ডিগ্রী আছে। খুব বন্ধুত্ব ছিল অলঙ্কারের সঙ্গে। বিরাট বড়লোক।'

'আমাদের বিপদের কথা শুনেই বোধহয় চাকরিটি যোগাড় করে দিচ্ছে। বউমা তোমাকে কিছু বলে নি ?'

'না। সাহস পায় নি হয়তো। আমি তাকে চাকরি নিতে মানা করেছিলাম। এই অসভ্য দেশে ভদ্র মেয়েদের রাস্তায় বেরোন উচিত নয়। কিন্তু মোটরে যদি যাতায়াত করবার সুযোগ পায় তাহলে আপত্তি করব না। টাকার তো সত্যিই দরকার। আমি ভাবছি টাকার যদি সুবিধে হয়, ওর মেয়ে দুটোকে কোন ক্রিশ্চান স্কুলের বোর্ডিংয়ে রেখে দেব। ওর মা যদি ওদের দেখা-শোনা করবার সুযোগ না পায়, তাহলে ওদের লেখাপড়া হবে না।'

'ক্রিশ্চান স্কুলের বোর্ডিংয়ে কেন ?'

'ক্রিশ্চান স্কুলেই আজকাল ভালো পড়াশোনা হয়। অন্য জায়গায় রাজনীতি হয়, আর কিছু হয় না। মাস্টাররা হয় অনুপযুক্ত, নয় অসাধু, নয় দুইই। বাড়িতে পড়ানোই সব চেয়ে ভালো। কিন্তু পড়াবে কে? ভালো প্রাইভেট টিউটার পাওয়াও সমস্যা আজ-কাল। বিশেষত মেয়েদের জন্যে—'

পারুলবালা ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছিলেন। ওই-ভাবেই তিনি দাঁড়ান। দাঁড়ালে ডানদিকটা একটু কাত্ হয়ে থাকে। রোগা পাতলা মানুষ তিনি, এভাবে দাঁড়ালে বেশ মানায় তাকে। যৌবনকালে খুবই মানাতো। তাঁর দিকে চেয়ে সেই যৌবন-কালের ছবিটা হঠাৎ মনে পড়ল নবীন দত্তের। তাঁর ষোড়শী বধূকে বহুদিন পরে তিনি যেন দেখতে পেলেন—যে তাঁর কলেজ যাবার সময় নিজে হাতে দু' খিলি পান সেজে নিজে তাঁর মুখে পুরে দিত। তখন ওর হাতে বাজু ছিল। কানে দুল ছিল। এখন নবীন দত্ত পান খান না, হরতুকি খান। পারুলও আর কোনও গয়না পরে না। হাতে খালি শাঁখা আর নোয়া। মেয়েদের বিয়েতে অধিকাংশ গয়নাই মেয়েদের দিয়ে দিয়েছেন।

হঠাৎ নবীন দত্ত বললেন—'পান খেতে ইচ্ছে করছে। নীচে থেকে দু' খিলি পান সেজে পাঠিয়ে দাও তো।'

'পান খাবার ইচ্ছে হল যে আজ '

'এমনি—'

পারুলবালা চলে গেলেন।

নবীন দত্তের আবার ভাবনা হল। সাবিত্রী চাকরি করবে? খগেশ্বর ওর চাকরি করে দিচ্ছে? অলঙ্কারের খুব বন্ধু ছিল। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল ইংরেজিতে। অলঙ্কারের বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছিল।

সাবিত্রীকে একটা হার উপহার দিয়েছিল বিয়ের সময়। বড়-লোকের ছেলে খগেশ্বর। অলঙ্কার তো মারা গেছে অনেক দিন আগে। এতদিন তো ও কোনও খবর নেয় নি। এতদিন পরে তার বউকে চাকরি যোগাড় করে দিচ্ছে এর মানে কি! সাবিত্রী কি ওকে লিখেছিল না কি কিছু? আগে কোন বিবাহিত মেয়ে স্বামীর বন্ধুকে চিঠি লিখত না, পারুল তাঁর কোন বন্ধুকে চিঠি লেখে নি কখনও, লেখবার কথা ভাবতেও পারে না। কিন্তু আজ-কালকার মেয়েরা পারে, চিঠি লেখেও। লেখাটা যে খুব অন্যায় তা মনে করেন না নবীন দত্ত। কিন্তু তিনি জানেন, পরপুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করলে অযথা নানা রকম অবাঞ্ছিত ফ্যাকড়া, ইংরেজিতে যাকে বলে—কমপ্লিকেশন—হতে পারে। বিশেষত বিধবার পক্ষে। মেয়ে মানুষের মন লতার মতো। কাছে শক্ত, সমর্থ কাউকে পেলে আঁকড়ি বার করে তার উপর নির্ভর করতে চায়। মোটর পাঠিয়ে আপিসে নিয়ে যাবে, আবার দিয়ে যাবে? নবীন দত্তের ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হয়ে গেল। কিন্তু বেশীক্ষণ কুঞ্চিত হয়ে থাকল না, বড় দৌহিত্র প্রতাপ এসে প্রবেশ করলেন। হাতে একটা বাটি।

'মা তোমার জন্যে খাবার পাঠিয়েছে।'

'কি খাবার?'

'আগে দেখতে দেব না। তুমি চোখ বুঁজে হাঁ কর। খেয়ে বল জিনিসটা কি—'

নবীন দত্ত চোখ বুঁজে হাঁ করলেন। প্রতাপ বাটি থেকে একটা ছোট পানতোয়ার মতো বার করে ঢুকিয়ে দিলে তাঁর মুখে। নবীন দত্ত খেয়ে বললেন—'খেতে মন্দ হয় নি। তবে ছানার নয়।'

'কিসের বল না?'

'আলু বোধহয়। মিষ্টি আলু?'

'না। ডিমের সঙ্গে পোস্ত দানা গুলে, বড়ার মতো করে ভেজে সেগুলো রসে ফেলেছে। ভালো হয় নি?'

'চমৎকার। আর একটা দে—'

হাত পাতলেন নবীন দত্ত।

'দাদু, তোমার হাতে নখ এত বড় বড় কেন!'

'তার কারণ তুমি। আমার ছুরিটি চুরি করে নিয়ে গেছ। নাপিতের দেখা পাচ্ছি না।'

'বাঃ, চুরি করতে যাব কেন! তুমি তো দিয়েছ আমাকে। প্রথমে যখন চেয়েছিলাম তখন অবশ্য 'না' বলেছিলে। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন চাইলাম তুমি চুপ করে রইলে। আমি ভাবলাম মৌনং সম্মতি লক্ষণং, তাই নিয়ে গেলাম। আচ্ছা, আমি তোমাকে একটা ভালো 'নেল কাটার' কিনে দিয়ে যাব।'

'আমি সেকেলে লোক, নেল কাটার দিয়ে নখ কাটতে পারব না। ওই ছুরিটার উপর তোমার এত লোভ কেন? তোমরা তো ব্লেড দিয়ে দাড়ি কামাও, নেল কাটার দিয়ে নখ কাটো, ফাউন্টেন পেন দিয়ে লেখ—ছুরি নিয়ে কি কর তুমি—'

'কিচ্ছু করি না। আমার একটা ওল্ড্ কিউরিয়সিটি বাক্স আছে, তাতে রেখে দিয়েছি। তোমার ছুরির বাঁটটা দেখেছ? অদ্ভুত! প্রকাণ্ড একটা কুমীর খোদাই করা আছে ওর উপর। দেখেছ? তোমাকে আর একটা ছুরিই এনে দেব তাহলে—'

'আজকালকার ছুরিতে কিছু কাটা যায় না।'

'তাহলে তোমার নখের কি ব্যবস্থা হবে?'

'রঞ্জিত নাপিত দেশে গেছে, সে ফিরুক, তখন কেটে·নেব। ও কথা থাক—'

'রঞ্জিত যদি দেশ থেকে না ফেরে, তাহলে তুমি নখই কাটবে না?'

'তখন প্রতাপকে বাহাল করব। রঞ্জিতের মৃত্যুসংবাদ না আসা পর্যন্ত তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।'

হো হো করে হেসে উঠল প্রতাপ।

'আচ্ছা একগুঁয়ে লোক তো তুমি- '

'আমার কথা থাক তোমার কথা বল। পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?'

'পড়াশোনা তো করি না। কলেজে প্রফেসারবরাও পড়ায় না, আমরাও পড়ি না। পড়ে হবেই বা কি? কলেজে যা পড়তে হয় বাইরে তো তা কাজে লাগে না। বাবা বলেছেন, পাশ করলেই তাঁর আপিসে ঢুকিযে দেবেন। তাঁর আপিস মানে কয়লার কারবার। সেখানে শেক্সপিয়র, মিল্টন বা রবীন্দ্রনাথের স্থান নেই। সেখানে খদ্দের পটানোই কাজ, আর আপিসের মামুলী কেরাণীগিরি। সরকার মশাই যদি আগেই রিটায়ার করতেন তাহলে আমাকে এম. এ. পড়তে হ'ত না। বাবা বললেন—যতদিন সরকার না রিটায়ার করছে—ততদিন এম. এ.টা পড়ে ফেল। ইতিমধ্যে পারিস তো বি.সি. এস.টা দিয়ে ফেল। সবই রোজগারের পন্থা দাদু। আর ওসব সাহিত্যটাহিত্য আমার ভালোও লাগে না তেমন। মাথাতেও ঢোকে না।'

'পরীক্ষা পাশ করবি কি করে?'

'টুকে। কিংবা নোট পড়ে। তোমার নোটবইটা শুনেছি বেশ ভালো। আমাকে কয়েকটা ইম্পরট্যান্ট কোশ্চেন লিখে দেবে দাদু?'

'আমরা সেকেলে লোক তো আমাদের কাছে সবই ইম্‌পরট্যাণ্ট মনে হয়।'

'প্লীজ, দাদু, বলে দিও—দু'একটা কোশ্চেন। তুমি তো মাঝে মাঝে পেপার সেটার হতে শুনেছি—'

'ভুল শুনেছ। আমি খোসামোদ করতে পারি না। দুর্গা বলে বইগুলো একবাব পড়েই ফেল না। দেখ না কেমন লাগে। ছবির বাঁট দেখে তুমি মুগ্ধ হয়েছ, ওথেলো বা হ্যামলেট পড়লেও হবে—'

'বড় খটমট। কেউ বুঝিয়ে দেয় না।'

'নোট দেখে পড়। যেখানটা বুঝতে পারবে না আমার কাছে এসো বুঝিয়ে দেব।'

'তোমার নোটবইগুলো কবে বেরুবে ?'

'রাখাল জানে। আমি বলতে পারব না। ছাপা হচ্ছে, এইটুকু শুনেছি। একটু আগে একটা প্রুফ এনেছিল, ভুলে ভরতি। আবার আনতে বলেছি—'

'কিন্তু পবীক্ষাব আগে যদি না বেরোয়, তাহলে তো বিক্রীই হবে না।'

'রাখাল চেষ্টা করছে। দেখি কতদূর কি করতে পারে--'

'আমি উঠি এখন - '

'এত তাড়া কিসের—বস না।'

'রবীন্দ্রসদনে ব্যালে নাচ হচ্ছে। সেটা দেখব, টিকিট কিনেছি। চলি, কেমন ?'

প্রতাপ চলে গেল।

গালে হাত দিয়ে বসে রইলেন নবীন দত্ত। তথাকথিত আধুনিক

যুগের ছোপ তাঁর পরিবারেও লেগেছে। তাঁর আর এক বন্ধু নগেন ভট্চায্যির কথা মনে পড়ল। তাঁর ছেলে বিয়ে করেছে এক সোনার বেনের মেয়েকে। যে বংশে তার জন্ম, সে বংশের মর্যাদা-বোধ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা নেই ছোকরার। সে সত্যেন দত্তেব একটা কবিতা আউড়ে দিয়েছে যে জাতিভেদ মানে না – জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানব জাতি। মানব জাতির মধ্যে কিন্তু চিরকাল নানারকম জাতি আছে। নানা বিভিন্ন নামে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সব সমাজে চিরকাল আছে, সব সমাজে চিরকাল থাকবে। আজকাল অনেক ব্রাহ্মণ পতিত হয়েছে, নগেনের বংশে সুরেনই তো অব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের বংশে কোনও গুণই তার মধ্যে নেই। প্রকাশ—সে সোনার বেনের মেয়েকে বিয়ে করেছে প্রেমে পড়ে। ওই প্রেমটা কিন্তু কামেরই ছদ্মবেশ। ত্যাগের কষ্টিপাথরে প্রেমের বিচার হয়। ও ছোকরা কিছুই ত্যাগ করে নি। বাপের তৈরি পাকা ইমারতে সুখে বাস করেছে, মেয়েটিও নাকি বেশ শাঁসালো। নগেন ভট্টাচার্যের বংশে অনেক বড় বড় পণ্ডিত জন্মেছিল, সেকালের গোঁড়া পরিবার ওরা, বাড়িতে শাল-গ্রাম-শিলা আছে। মেয়েটি না কি কোন ধর্মই মানে না। জুতো খটখটিয়ে ঠাকুরঘরের সামনে দিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে বব্‌ড্‌ হেয়ারের বাহার তুলে যাতায়াত করে। শ্বশুর শাশুড়ির মনে যে আঘাত লাগতে পারে এ জ্ঞান সে মেয়েটার নেই, ছেলেটারও নেই। নিজের বংশের মর্যাদাবোধই নেই ওদের। ওরা খালি স্বার্থ চেনে, টাকা চেনে, সুবিধা চেনে, প্রয়োজনের জন্য রং বদ-লাতে মুখোশ বদলাতে আপত্তি নেই ওদের। তাতে বাপ মার মনে আঘাতই লাগুক বা বংশমর্যাদা চুলোয় যাক—ওরা দৃক্-

পাত করবে না। ওরা আধুনিক। নিজেদের গায়ে 'আধুনিক' এই ছাপ লাগিয়ে ওরা যে কোনও বেলেল্লাগিরি করবে এবং ওদের দাবি তা সহ্য করতে হবে। বলতে হবে—ওরা আজকাল-কার ছেলেমেয়ে, ওরা তো করবেই। আধুনিক সাহিত্য মানে দুর্গন্ধ কামসাহিত্য। তাতে নাকি বাস্তবতা ফুটেছে। আগেকার কবিরা না কি অবাস্তব স্বপ্নলোকে বাস করতেন।'জীবনের ছাপ নেই ওদের কৃতিতে। নবীন দত্ত কিন্তু জানেন তা সত্ত্বেও টিঁকে থাকবেন মিল্টন, সেক্সপীয়র, শেলি, কীটস, মধুসূদন. বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ। ভেসে যাবে এরাই—এই হেঁজিপেঁজি হা-ঘরে আধু-নিকের দল যারা রাস্তায় উলঙ্গ হয়ে দুহাত দিয়ে উন্মাদের মতো বে-আব্রু হ'য়ে গুহ্য আর বস্তিপ্রদেশ চুলকুচ্ছে। তারা কখনও স্থান পাবে না জগতের রসিক সমাজে। কখনও পায় নি। রাস্তার কুকুর বেড়াল পাখীপক্ষীরাও ওই বাস্তব কর্ম আবহমান কাল থেকে করছে, কিন্তু সাহিত্যিক বলে কেউ গণ্য করে নি তাদের। বরং তাদের নিয়ে প্রতিভাবান কবিরা কখনও ক্বচিৎ যে অবাস্তব কাব্য সৃষ্টি করেছেন তাই সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। থাকবে। এরা একটা ময়লা প্রদীপ নিয়েই নাড়াচাড়া করছে। তার মলি-নতা নিয়েই যত আস্ফালন। সেটাকে আলাদিনের প্রদীপ করতে পারে নি। পারে নি, কিন্তু বাহাদুরির অন্ত নেই, ওই অক্ষমতা নিয়েই লম্ফঝম্ফ করছে ওরা। করুক। কুকুর-বেড়ালদের থামানো যায় না, এদেরও যাবে না। এখন চারিদিকে অন্ধকার। অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা করতে হবে সূর্যের জন্য। সূর্য উঠলে ফুল ফুটবে। সূর্য উঠবেই একদিন। সে দিনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য যেন থাকে। এই সব কথাই

এলোমেলো ভাবে ভাবছিলেন নবীন দত্ত। হঠাৎ তাঁর সাবিত্রীর কথাটা আবার মনে পড়ল। ইণ্টারভিউ দিয়ে এসেছে ? তাঁকে জানায় নি কেন। সাহস হয় নি ? সাহস না হবার কারণ কি ? তিনি মানা করবেন এ আশঙ্কা কেন করেছিল সাবিত্রী ? তিনি তো আগে ওকে চাকরি কবতে অনুমতিই দিয়েছিলেন, ওর রূপই ওর চাকরির পথে বাধা হল বলে তিনি মানা করেছিলেন। এখন যদি মোটরে যাতায়াত করার সুযোগ পায়—চাকরি করুক না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রাচীন প্রবচন তাঁর মনে পড়ল—ঘোমটার নীচে খ্যামটা। এ খ্যামটা নাচ চিরকাল চলছে। এ থামানো যায় নি, থামানো যাবে না। মানুষের মধ্যে পশুত্ব যতদিন থাকবে ততদিন এটা চলবে। সুতরাং—। তাঁর চিন্তাধারা থমকে গেল। তারপর বললেন—যা চলছে চলুক। বলেই উঠে পড়লেন। তাঁকে টিউশনি করতে যেতে হবে।

নবীন দত্তের দুটি টিউশনি ! দুটিই ছেলে। মেয়েদের টিউশনি তিনি নেন নি। একজন ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের জন্য মাসে আড়াই শ' টাকা দিতে রাজী হয়েছিলেন। টিউশনিটি নিয়েও ছিলেন তিনি। কিন্তু পড়াতে গিয়ে মেয়ের সাজসজ্জা দেখে ভড়কে গেলেন। ঠোঁটে রং, চোখে কাজল, গালে রুজ, পেন করা মুখ, বব্ করা চুল, প্রায় অনাবৃত যৌবনপুষ্ট দেহ, ন্যাকা-ন্যাকা কথা দেখে তাঁর ঘৃণা হল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যাকে দেখে তাঁর ঘৃণা হচ্ছে তাকে তিনি ঠিকমতো পড়াতে পারবেন না। ছাত্র-ছাত্রীকে ভালো না লাগলে তাদের পড়ানো যায় না। ফাঁকি দিয়ে সময় হরণ করা যায়, কিন্তু তাকে শিষ্যারূপে গ্রহণ করা যায় না। নবীন দত্ত তার পরদিন থেকে আর যান নি, লিখে পাঠিয়েছিলেন—আমি পারব

না, মাপ করবেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভাগ্যে তিনি আর একটি টিউশনি পেয়ে গেলেন, তা না হলে একটু মুশকিলেই পড়তে হত তাঁকে। তাঁর একটি ছাত্র আগেই ছিল। সে মাসে একশ' টাকা করে দিন। সপ্তাহে দু' দিন করে পড়াতেন তাকে। কিন্তু সাবিত্রীর চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার পর আরও একশ' টাকা রোজগার করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। মেয়ে ছাত্রীটিকে পড়ালে তাঁর অভাবের অতিরিক্ত কিছু টাকা হাতে জমত, কিন্তু তা আর হল না। তাঁর প্রথম ছাত্রটি আর একটি মেয়ে জুটিয়ে দিয়েছিল তাঁকে। সপ্তাহে তিন দিন পড়বে, মাসে দেড়শ' টাকা করে দেবে। কিন্তু মেয়ে শুনেই রাজী হলেন না নবীন দত্ত। বললেন--মেয়ে ছাত্র আমি পড়াতে পারব না। তুমি তার জন্যে মেয়ে-প্রফেসার খুঁজে দাও। কোনও পুরুষ ছাত্র যদি আমার কাছে পড়তে চায়, আর আমার যদি তাকে পছন্দ হয় তবেই আমি পড়াব। আমি কুলী নই যে পয়সা পেলে যে কোনও মোট বইব। আমি অধ্যাপক, যাকে পড়াব তাকে যদি ভালো না লাগে তাহলে তাকে পড়ানো যাবে না ঠিকমতো। মন খিঁচড়ে থাকলে পড়ানো যায় না।

'তবে ক্লাসে এতদিন কি করে পড়াতেন সার'--জিজ্ঞাসা করেছিল ছেলেটি।

নবীন দত্ত উত্তর দিয়েছিলেন—'ক্লাসে লেকচার দেওয়া আমার চাকরি ছিল, ক্লাসে এক ঘণ্টা লেকচার দিতাম। এক মিনিটও ফাঁকি দিই নি। ক্লাসকেই পড়াতাম। কোনও বিশেষ ছেলে বা মেয়েকে নয়। আমার লেকচার থেকে কোনও ছাত্র বা ছাত্রী কোনও শিক্ষা পেয়েছে কি না—গড্ নোজ। আমি জানি না।

ক্লাসের পর দু' একজন ছাত্র-ছাত্রী আমার কাছে মাঝে মাঝে এসেছে, তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করেছি। ব্যস্—এর বেশী আমি আর কি করেছি। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র-শিক্ষকের অন্তরের যোগ কদাচিৎ হয়। যেখানে হয় সেখানে সুফল ফলে। তাই আমি আমার মনের মতন ছাত্র বেছে নিতে উৎসুক। বাজে-মার্কা ছেলেকে পড়িয়ে তার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার সরল অর্থ তার বাবা-মাকে ঠকানো। আমার অভাব আছে সত্যি—কিন্তু ঠক হতে পারব না।'

নবীন দত্তের এই ছাত্রটি তাঁর অনেক দিনের পুরাতন ছাত্র। বাংলায় এম. এ. পাশ করেছে। এবার ইংরেজিতে দিতে চায়। বড়লোকের ছেলে, একমাত্র ছেলে। কিন্তু ভারী ভালো ছেলেটি। বিনয় নাম। নামের মর্যাদা ও রেখেছে। বি. এ. পড়বার সময় নবীন দত্ত ওকে ইংরেজিতে কোচ করেছিলেন। অনার্স পেয়েছিল। বাংলাতেও অনার্স পেয়েছিল। বাংলাতেও ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। এবার ইংরেজিতে দেবে। নবীন দত্ত পড়ান তাকে।

বিনয় বলল—'আপনি যা চাইছেন তা আজকাল পাওয়া শক্ত। একটি জানাশোনা ছেলে টিউটার খুঁজছে। ছেলেটি খারাপ নয়। কিন্তু তার চওড়া জুলফি আছে ’

'ও ছেলে আমি পড়াতে পারব না!'

বিনয় হেসে বললে—'ভালো অধ্যাপকরা যদি এদের না পড়ান তাহলে এদের গতি কি হবে।'

নবীন দত্ত সংক্ষেপে বললেন—'দুর্গতি।'

বিনয় ওদের হয়ে ওকালতি করতে লাগল।

'ওরা ফ্যাসানের স্রোতে ভেসে চলেছে, ওদের বাইরেটাই একটু

কিম্ভুত গোছের। ভিতরে ওরা সবাই খারাপ নয়। ভূপেন জুলফি রেখেছে বটে, কিন্তু ছেলেটি ভালো।'

'কিন্তু ওদের মধ্যে অনেকরই মন বিষিয়ে দিয়েছে আজকালকার বাজে নেতা, বাজে সাহিত্যিক, আর বাজে প্রফেসারগুলো। ওরা অনেকেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে যেহেতু ওরা যুবক সেই হেতু ওদের অভব্যতা করবার অধিকার আছে। ওরা ওদের বুলি মুখস্থ কবে বলতে শিখেছে এদেশের ভদ্রলোক মাত্রেই শোষক সম্প্রদায়ের লোক। ওরা জেনারেশন গ্যাপের থিয়োরি আউড়ে জাহির করে বেড়াচ্ছে গত যুগের সঙ্গে এ যুগের আকাশ পাতাল তফাৎ হয়ে গেছে। সুতরাং ওরা নতুন-কিছু হয়েছে। হলে আপত্তি করতাম না, কিন্তু হয় নি, মুড়ি মুড়িই আছে—নামটা হয়েছে চাল-ভাজা। নানা রকম প্যাকেটে মোড়া আছে যদিও। অধিকাংশই আবার মিয়োনো!'

'আমি ভূপেনকে নিয়ে যাব একদিন আপনার কাছে—'

'এসো'।

জুলফি সত্ত্বেও ভূপেন ছেলেটিকে ভালো লেগে গেল নবীন দত্তের। ভূপেন এসেই প্রথমে প্রণাম করল, তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। চোখে মুখে সম্ভ্রম আর একটু ভীতু-ভীতু হাসি।

বিনয় বলল—'এই সার ভূপেন। ইংরেজিতে এম. এ. পড়ছে। আপনার কাছে পড়তে চায়—'

'টুকে পরীক্ষা পাশ করবার দিকে ঝোঁক আছে না কি?'

'আজ্ঞে না—'

'নেই কেন। সবাই তো ওই করছে। ডিগ্রীর ছাপ মারা একটা কাগজ পাওয়াই তো উদ্দেশ্য। তার জন্যে আমার কাছে প্রাই-

ভেট পড়বার দরকার কি—কোনও চোরের সন্ধান নাও।'

ভূপেন বলল—'আমি ডিগ্রীর জন্য পড়ছি না সার। ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা করতে চাই। এম. এ. ক্লাসে ভরতি হয়েছি, কারণ, ভালো লাইব্রেরির সাহায্য পাব, ভালো অধ্যাপকদের দেখা পাব, এই জন্যে। আপনি যদি আমাকে পড়ান তাহলে তো সেটা ভাগ্য বলে মনে করব আমি।'

ভূপেনের মুখের দিকে চেয়ে নবীন দত্ত প্রশ্ন করলেন—'জুলফি রেখেছ কেন?'

'রাখতে হয়েছে, কারণ ওটা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। বাবার, ঠাকুরদার, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহ—এই চার পুরুষের ছবি আমাদের বাড়িতে আছে। প্রত্যেকেরই জুলফি।'

'তাই নাকি।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। জাতে আমরা রাজপুত। মেবারের কাছে আমাদের পূর্বপুরুষরা থাকতেন। তারপর অনেক দিন আগে তাঁরা রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশে চলে আসেন। সাত পুরুষ আমরা বাংলা দেশে বাস করছি। এখন আমরা বাঙালী।'

তারপর একটু হেসে বলল—'জুলফিটা আমাকে ঠিক মানায় না। কিন্তু বংশের প্রথা বলেই রেখেছি—আমার মায়ের ওটা ইচ্ছে।'

নবীন দত্ত খুব খুশি হলেন মনে মনে। বললেন 'বেশ তোমায় পড়াব। কিন্তু তার আগে তোমাকে একটু বাজিয়ে নেব। চসার পড়েছ?'

'ক্যানটারবেরি টেলস্ পড়েছি—'

'বেশ। নিজের ভাষায় চসার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখে এনে দেখাও আমাকে। পনেরো দিন সময় দিলুম।'

'কিন্তু আমি আজ থেকেই আপনার শিষ্য হলুম। ভালো দিন দেখে বেরিয়েছি –'

এই বলে হেঁট হয়ে সে প্রণাম করল এবং একটি একশ' টাকার নোট তাঁর পায়ের কাছে রেখে দিল।

'ওটা কি ?'

'গুরুদক্ষিণা।'

'দক্ষিণা শেষে দিতে হয়। আগে নেব না।'

'তাহলে প্রণামী বলে নিন।'

'না—তা-ও নেব না। এসব ভড়ং করবার যোগ্যতা আমার নেই। আসল কথা, তোমার প্রবন্ধটা দেখে আগে ঠিক করি তোমাকে নেব কি না। তাবপর টাকাকড়ির কথা হবে। দেখ, যেদিন থেকে আমরা বিদ্যা বিক্রয় করতে শুরু করলাম সেই দিন থেকে আমাদের অধঃপতন শুরু হয়েছে। গুরু যেদিন অর্থের দাস হল, অথদাতা শিষ্যের চাটুকার হল, সেইদিনই আমাদের বারোটা বেজে গেছে।'

'কিন্তু আপনাদের সংসার চলবে কিসে ?'

'সেটা দেখবেন দেশের রাজা বা স্টেট। যে বিদেশের নকল আমরা করেছি সেখানেও ভালো অধ্যাপকদের অর্থাভাবে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হয় না। ভালো অধ্যাপককে স্টেট গুরুর আদরেই রাখেন সেখানে। কিন্তু এখানে সে সব হবার উপায় নেই। ইংরেজদের আমলে গুণের কিছু কদর তবু ছিল, এখন একদম নেই। এখন ভাইপো-ভাগনেদের দবাদবা, রক্ষিতার আত্মীয়দের রবরবা, এখন ভদ্রলোক বিপন্ন। সভায় সভায় যে সব আদর্শের আস্ফালন, কার্যকালে সে সব আদর্শের মুলোচ্ছেদ।

বাইরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন। যাক্ এসব বলে আর কি হবে। নিয়তিকে ওলটানো শক্ত। তবু চেষ্টা করতে হবে। ওই চেষ্টা ওই পুরুষকারই আমাদের একমাত্র ভরসা এখন।'

হঠাৎ থেমে গেলেন নবীন দত্ত।

তারপর বললেন—'প্রফেসারদের একটা দোষ কি জান? মহা বাক্যবাগীশ তারা। বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলে থামতে জানে না। আচ্ছা, আজ তুমি চলে যাও। 'এসে'টা লিখে এনো।'

ভূপেন সাত দিনে পরেই লিখে এনেছিল প্রবন্ধটা।

নবীন দত্তের এতো ভালো লেগেছিল যে তিনি বলেছিলেন—'বেশ, তোমাকে পড়াব। মাইনে না দিলেও পড়াব। চমৎকার হয়েছে লেখাটা—'

ভূপেন চক্ষু অবনত করে বলেছিল—'মাইনে কিন্তু নিতে হবে।'

'বেশ।'

নবীন দত্তের এই দুটি ছাত্র তাঁর ছেলের মতন। এদের উপর মনে মনে অনেকখানি নির্ভর করেন তিনি। বাইরে অবশ্য এদের কাছ থেকে এক মাইনে ছাড়া অন্য কিছু নেন নি। কারো কাছে কোনও কিছু চাইতে তাঁর ভারী লজ্জা হয়, মনে হয় মাথা কাটা যাচ্ছে যেন। নিজের ছেলেদের কাছেও কখনও কিছু দাবি করেন নি তিনি। তারা স্বেচ্ছায় যখন যা দিয়েছে তাই নিয়েছেন। কিন্তু তা-ও সব সময়ে নিজের কাজে লাগান নি। তুম্ যে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে গেছে তা স্পর্শ করেন নি এখনও তিনি। অথচ এ জন্য মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়—এটা আমার চরিত্রের দোষ। সবার সঙ্গে মিলে মিশে গলাগলি করে থাকতে পারি না, এটা

কি আমার গুণ নাকি ? তাঁর সান্ত্বনা বিদ্যাসাগরেরও এ দোষ ছিল। বিদ্যাসাগরের ছবির দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। মনে মনে প্রশ্ন করলেন—ইয়ং সাহেবের সঙ্গে আপনি ঝগড়া করে-ছিলেন কেন ? মেরী কার্পেণ্টারের সঙ্গেও তো আপনার মতের মিল হয় নি, ফট্ করে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেন। বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাজকৃষ্ণ বসু, এদের সঙ্গেও আপনি ঝগড়া করেছিলেন, কার সঙ্গেই বা মতের মিল হয়েছিল আপনার ? ভাইদেব সঙ্গে, ছেলের সঙ্গে, বীরসিংহের লোকদের সঙ্গেও কারও সঙ্গে তো আপনার বনে নি। বিদ্যা-সাগরের নির্বাক ছবি নির্বাক হয়েই রইল। নবীন দত্তের মনে হল একটি নীরব উত্তর ফুটে উঠেছে কিন্তু তাঁব চোখের দৃষ্টিতে। তা যেন বলছে —মায়ের সঙ্গে আমার মতের কখনও অমিল হয় নি। ছবিটার দিকে আরও খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে নবীন দত্ত নেমে গেলেন। টিউশনি করতে যেতে হবে বালীগঞ্জে। বাসে বেশ কিছুক্ষণ লাগবে। তারপর ইচ্ছে আছে শিশুসমার খবর নেবেন একটু। তার বাড়িতে যাবেন না—ফোন করবেন। ভূপেনের বাড়িতে ফোন আছে। মেয়েটাকে খুব স্নেহ করেন তিনি। কিন্তু তাকে ঠিক বুঝতে পারেন না। মাঝে মাঝে মনে হয়, কাকেই বা বুঝতে পেরেছেন তিনি। সবাই তো দুর্জ্ঞেয় রহস্য এক-একটি। তুম্‌কে বুঝতে পেরেছেন ? পারেন নি। পারুলকে পেরেছেন ? পারেন নি।

রাস্তায় নেবেই একটা পিঠকাটা জামা-পরা [illegible] দেখা পেলেন। [illegible] কাপড়টা প্রায় খোলা। প্রকৃতি যে তাঁকে [illegible] দিয়েছে এইটে বিজ্ঞাপিত করতে করতে চলেছে। কোনও ছোঁড়া

ওর ওপর যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে খুব দোষ দেওয়া যাবে কি? প্রকৃতি [illegible]মাত্রকেই [illegible] দিয়েছেন, ওতে ওর নিজের কৃতিত্ব কিছু নেই। কৃতিত্ব আস্ফালন করাটাও অশোভন। কিন্তু বোকা মেয়েটা তা বোঝে না। ছ্যা, ছ্যা, আমরা কোথায় নেবে গেছি।

বাস এসে পড়ল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন নবীন দত্ত। সেখা-নেও গুঁতাগুঁতি ঠেলাঠেলি অসভ্যতার চরম। তবু তার মধ্যেই একটি মহিলা নিজের সীট ছেড়ে উঠে পড়লো—'আপনি আমার সীটে বসুন।'

'কে আপনি?'

'আমি আপনার ছাত্রী ছিলাম বিদ্যাসাগর কলেজে।'

প্রণাম করল মেয়েটি।

এই ভীড়েই হঠাৎ যেন স্বর্গ হাতে পেলেন তিনি।

শ্যামবর্ণা রোগা মেয়েটিকে স্বর্গের দেবী বলে মনে হল তাঁর।

'তুমি বস। আমি বেশ তো দাঁড়িয়ে আছি—'

'না, না। আপনি বসুন।'

জোর করে বসিয়ে দিলে মেয়েটি তাঁকে তার সীটে। বসেই নজরে পড়লো ওদিকের সীটে একটা চকরাবকরা-শার্ট পরা নীল চশমা চোখে জুলফিদার ছোকরা খ্যা খ্যা খ্যা করে হাসছে। চোখ বুঁজে রইলেন নবীন দত্ত।

ভূপেন্দ্রকে শেক্সপীয়রের ক্লিওপেট্রা ও বার্ণার্ড শ'র ক্লিওপেট্রা নিয়ে একটা তুলনামূলক সমালোচনা লিখতে বলে নবীন দত্ত শিশুসমাকে ফোন করছিলেন।

'শিশু, কেমন আছিস ?'

'ভালই তো আছি। আপনি আর আসেন না কেন ?'

'রাগ হয়েছে। তাছাড়া সময়ই বা কই। রোজগার করে সংসার চালাতে হয় তো। ব্যস্ত থাকি। তা ছাড়া রাগও হয়েছে—'

'আমার উপর ?'

'না। তোর বাবার উপর—'

'বাবার খুব অসুখ। সেই জন্যই আপনার কাছে যেতে পারি নি।'

'কি হয়েছে ?'

'ডাক্তার ক্যানসার সন্দেহ করছে।'

'সে কি! কোথায় ক্যানসার হয়েছে ?'

'প্রস্টেটে—'

'তাই নাকি। আমি যাচ্ছি একটু পরে—'

'কোথা থেকে ফোন করছেন ?'

'বালিগঞ্জ থেকে।'

'ট্রামে বাসে আসতে অনেক দেরি হবে তো ?'

'হ্যাঁ, ঘণ্টা দেড়েক লাগবে।'

'আপনি ঠিকানাটা বলুন না, গাড়ি পাঠিয়ে দিই।'

'না। গাড়ি পাঠাতে হবে না।'

ফোন কেটে দিলেন নবীন দত্ত।

ঘণ্টা দুই পরে ধীরেশের কাছে গিয়ে দেখলেন ধীরেশ বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁকে দেখে হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন তিনি।

'নবীন, আমি তো এবার চললুম। তুমি শিশুর বিয়ে দিয়ে দাও এবার।'

নবীন চুপ করে রইলেন্। একটু পরে বললেন—'একেই তো রোগে কষ্ট পাচ্ছেন। মেয়ের বিচ্ছেদযন্ত্রণা কি এর উপর সইতে পারবেন? ওসব কথা এখন থাক—'

ধীরেশের চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল পড়তে লাগল। তার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলেন নবীন দত্ত।

৩

ধীরেশের মৃত্যুর ঠিক পাঁচ দিন পরেই তাঁর শাশুড়ীরও মৃত্যু হল। ধীরেশ হাসপাতালে ছিলেন। মৃত্যুর দু'দিন আগে তিনি অজ্ঞানও হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে নবীন দত্ত তাঁকে দেখতে গিয়ে দেখলেন নির্বাক হয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছেন। চোখ দিয়ে জল পড়ছে। শিশু দুহাতে মুখ ঢেকে বসে আছে তার মাথার শিয়রে। নবীন দত্ত পাশের টুলটিতে সন্তর্পণে বসলেন। ধীরেশবাবুর জন্যে একটা আপেল আর একটা কমলালেবু নিয়ে গিয়েছিলেন। সে দুটো নীরবে রেখে দিলেন পাশের টেবিলে। চারদিকে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। নার্সরা সন্তর্পণে যাতায়াত করছেন। দূরে কোথায় যেন একটা ফোন বেজে উঠল।

একটু পরে একটি নার্স এসে বললেন—'আপনিই কি নবীন বাবু?'

'হ্যাঁ। কেন—'

'আপনার স্ত্রী ফোন করছেন—আপনি এখুনি বাড়ি চলে যান। আপনার শাশুড়ির অবস্থা ভালো নয়।'

নবীন দত্ত উঠে দাঁড়ালেন। তারপর শিশুসমার কাছে গিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললেন—'আমি বাড়ি যাচ্ছি। আমার শাশুড়ীর অবস্থা খারাপ'—বলেই চলে যাচ্ছিলেন। একটু দূরে গিয়ে দেখলেন শিশুও তাঁর পিছু পিছু আসছে।

'তুমি উঠে এলে কেন?'

'ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি সে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক।'

'ধীরেশবাবুর সম্বন্ধে ডাক্তাররা কি বলছেন?'

'বলছেন কোন আশাই নেই।'

'গাড়িটা এখানেই থাক। ধীরেশবাবুর জন্য কোনও জরুরি ওষুধ-পত্র দরকার হতে পারে—'

'সব আনিয়ে রাখা হয়েছে। আপনি নিয়ে যান গাড়িটা। এক-জন ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে যান। টাকা আছে আপনার কাছে?'

'আছে—। তুমি যাও বাবার কাছে বস গিয়ে—'

শিশু শুনল না। তাঁর পিছু পিছু গিয়ে ড্রাইভারকে বলে এল—এঁকে নিয়ে যাও।

প্রকাণ্ড বড় ডজ্ গাড়ি। ধীরেশবাবু মাত্র কয়েকদিন আগে 'এম্ব্যাসি' থেকে কিনেছিলেন। ইচ্ছে ছিল শিশুকে নিয়ে ভারত-ভ্রমণে বেরুবেন। তা আর হল না।

তাঁর একজন ছাত্র ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বিখ্যাত ডাক্তারদের চেয়ে অবিখ্যাত যুবক ডাক্তারদের উপর তাঁর বিশ্বাস বেশী। এই ছেলেটি আই. এস. সি. পড়বার সময় তাঁর কাছে ইংরেজি পড়েছিল। ভারী ভালো ছেলেটি। সেই তাঁর গৃহ-চিকিৎসক, পারুলের মায়ের চিকিৎসা সেই বরাবর করছে।

তাঁর শাশুড়ীর জ্ঞান ছিল। বুকে অসহ্য ব্যথা।

অমিয় তাঁকে পরীক্ষা করে বলল—করনারি।

'কি রকম বুঝছ ?'

'ভালো নয়। পাল্‌সের অবস্থা খুব খারাপ। তবু যা করা দরকার আমি করছি।'

'কোনও নামজাদা ডাক্তারের সঙ্গে 'কনসল্‌ট্‌' করতে চাও ?'

'করতে পারি। কিন্তু তাতেও যে ফাঁড়াটা কাটবে তা মনে হয় না। তবু ডাকুন একজনকে—'

একজন বড় ডাক্তারেরই নাম করলে সে। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বললে—'এঁকে ডাকলেই পাওয়া যায় না। অনেক আগে 'কল' বুক করতে হয়।'

'তুমি যা ভালো বোঝ কর।'

অমিয় ট্যাক্সি করে বেরিয়ে গেল এবং নিয়ে এল একজনকে। তিনিও বললেন—হোপলেস। এবং ওই একটি কথা বলার জন্য তাঁকে চৌষট্টি টাকা ফি দিতে হল। দিলেন নবীন দত্ত। সেই-দিনই তিনি এক ছাত্রের কাছ থেকে মাইনে পেয়েছিলেন।

ঘণ্টা দুই পরে মারা গেলেন তাঁর শাশুড়ী।

পারুল সাবিত্রী রেবতী পার্বতী সবাই মড়া-কান্না শুরু করলে।

নবীন দত্ত পাশের বাড়িতে গেলেন তাঁর শালাদের খবর দেবার জন্য। পাশের বাড়িতে ফোন আছে।

নবীন দত্ত বললেন—'সৎকার সমিতিতে খবর দাও, তারা সব ব্যবস্থা করবে।'
তাঁর বড় শালা বললেন, 'মায়ের মৃতদেহ মোটরে করে নিয়ে যাওয়া হোক এটা আমরা চাই না। মা সেকেলে লোক ছিলেন, সেকেলে ধরনেই নিয়ে যাওয়া হোক তাঁকে।'
ছোট শালা বললেন—'আমি একটা ভালো খাট কিনে আনছি—'
খাট কিনে নিয়ে এলেন তিনি। পারুলবালার ঘন ঘন ফিট হচ্ছিল। তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সাবিত্রী আর তার মেয়েরা। নবীন দত্ত পাড়ায় বেরুলেন শব-বাহক সংগ্রহ করবার জন্য। পাড়ায় দশ-বারো জন লোক রাজী হল। কিন্তু তারা যা চাইল তা তিনি প্রত্যাশা করেন নি। কারণ ওদের মধ্যে একজন কিছুদিন আগে তাঁকে অনুরোধ করেছিল এক সংস্কৃতি সভায় পৌরোহিত্য করবার জন্য। সে লোকটি অবশ্য সোজাসুজি তাঁর কাছে বলতে পারে নি। আর একজন লোকের মারফত জানিয়েছে। তিন বোতল ব্র্যাণ্ডি বা হুইস্কি চাই। শুনে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। শালাদের এসে বললেন—'আমি চাই না যে কতকগুলো মদ্যপ মাকে বয়ে নিয়ে যায়। তোমরা 'সৎকার সমিতি'কেই খবর দাও।'
বড় শালা হরবিলাস বললেন—'আপনি ও নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন। আমরা ওদের সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি।'

ছোট শালা হরিবিলাস ফোড়ন দিলেন···'মদ তো দিতেই হবে। ওটা তো রেওয়াজ হয়ে গেছে। সবাই তো মদ খাচ্ছে আজ-কাল। শুধু পুরুষরা নয়, মেয়েরাও। কোথায় আছেন আপনি জামাইবাবু—'
নবীন দত্ত কিছু না বলে সোজা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে নিমতলা ঘাটে যখন পৌঁছলেন তখন অন্ধকার। দেখলেন একটা চিতা জ্বলছে। সেই দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলেন তিনি। তাঁর শাশুড়ীর শবদেহ এল অনেকক্ষণ পরে। খাটটা নাকি খুব ভারী ছিল।

৪

শাশুড়ীর শ্রাদ্ধের সময় পারুলবালা তাঁর বাপের বাড়িতেই ছিলেন। তাঁর ভায়েরা যদিও তাঁর মায়ের জীবদ্দশায় তেমন খোঁজখবর করেন নি কিন্তু মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধটা করলেন জাঁক-জমক করে। আসল শ্রাদ্ধটা যদিও হল 'তিলকাঞ্চন' কিন্তু শ্রাদ্ধের ভোজটা হল শুধু দ্বাদশজন ব্রাহ্মণ ভোজনের ভোজ নয়, শালাদের বন্ধুবান্ধবদের ভোজ। হোটেল থেকে খাবার আনানো হয়েছিল। শাশুড়ীর দশহাজার টাকার একটা ইনসিওরেন্স করা ছিল। পুত্ররাই সে টাকা পাবে। অতগুলো টাকা যখন পাওয়া যাবে তখন মায়ের শ্রাদ্ধকে উপলক্ষ্য করে কিছু আমোদ-আহ্লাদ করা বোধ হয় অনুচিত হবে না—এই যুক্তিই বোধহয় জেগে-

ছিল ছেলেদের মনে। মায়ের যে সব গয়না কাপড় ছিল তা দুই বউই ভাগ করে নিয়েছিল। পারুলবালাকে তারা দিয়েছিল পুরোনো বিবর্ণ বোম্বাই শাড়ি একটি। পারুলবালা বলেছিলেন —ওটাও তোমাদের থাক। আমাব কিছুরই দরকার নেই। মায়ের শেষ সময়ে যে সেবা কবতে পেরেছি এইটেই আমার পরম ভাগ্য। বউদের এ শুনে নাকি মুখ ভার হয়েছিল। নবীন দত্ত শ্রাদ্ধের দিন গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ভোজে যোগদান করেন নি। শালাবা পীড়াপীড়ি করাতে বলেছিলেন—সেকালে আমরা যে ধবনেব ভোজ খেয়ে তৃপ্তি পেতাম সে ধরনের ভোজ তো হচ্ছে না। আজকাল হয় না। সেই সুগন্ধ চালের ভাত, মুগের ডাল, ভাজাভুজি, ছ্যাচড়া, ডালনা, ঝোল, ঝাল, অম্বল, ক্ষীব, পরমান্ন —এসব আজকাল কেউ খায়ও না, রাঁধতেও জানে না। হোটে-লের খাবার আমার সহ্য হয় না। আমি স্বপাকে খাই, তাই খাব গিয়ে। অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও চলে এসেছিলেন তিনি। পারুল-বালা চলে আসেন নি। কাজ শেষ হবাব দু'দিন পবে এলেন। এসেই তিনি সোজা চলে গেলেন নবীন দত্তের চিলে কোঠার ঘরে। নবীন দত্ত তখন তাঁর ইক্‌মিক কুকাব থেকে সিদ্ধ ডাল ভাত তরকারি ঢালছিলেন একটা থালার উপর। পারুলবালা এসেই প্রথমে জিগ্যেস করলেন—'দুমের কোন খবর এসেছে ?'

'না।'

পারুলবালা চুপ করে দাঁড়িয়ে স্বামীর খাওয়া দেখতে লাগলেন। তারপর বললেন—'কাল থেকে আমি তোমার জন্যে রাঁধব।'

নবীন দত্ত খেতে খেতে তাঁর মুখের দিকে চাইলেন একবার। তারপর আবার খেতে লাগলেন।

পারুলবালা বললেন, 'আমার তো এখন আর কিছু করবার নেই। আমি কি নিয়ে থাকব।'

'কেন, তোমার নাতনীরা তো আছে।'

'বউমা চাকরি পেয়েছে। সে রেবতী আর পার্বতীকে নিয়ে যাবে বলছিল।'

'নিয়ে যাবে ? কোথায় ?'

'আমি ঠিক জানি না। শুনছি যে চাকরি পাবে, সেটা নাকি স্কুলের হেড্ মিস্ট্রেসের চাকরি। স্কুলের কাছেই কোয়ার্টার আছে। খগেশ্বর বলেছে আপনার শ্বশুর শাশুড়ী যদি আপত্তি না করেন তাহলে আপনি ওই কোয়ার্টারেই থাকতে পারেন। আর যদি আপত্তি করেন তাহলে বাড়ি থেকেই মোটরে যাতায়াত করবেন। বউমার ইচ্ছে ওই কোয়ার্টারে গিয়ে থাকা --'

'মানে আমাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে চায় ?'

পারুলবালা চুপ করে রইলেন।

নবীন দত্ত বললেন--'তাকে ডাকো তো একবার। ব্যাপারটা পষ্টাপষ্টি জেনে নিই।'

'সে বাপের বাড়ি গেছে। যখন ফিরবে তখন পষ্টাপষ্টি জেনে নিও। কিন্তু আমি তুমের জন্য বড্ড অস্থির হয়ে উঠেছি। জার্মানির ঠিকানা কি, সেখানে টেলিগ্রাম, কি ট্রাংক কল করা যায় না ? দাদা বলছিল—যায়- '

'যায়। কিন্তু তাতে অনেক ঝঞ্ঝাট, বেশ কিছু খরচও আছে। আমি তার ঠিকানা ফোন নম্বর সব লিখে দিচ্ছি, তোমার দাদার সাহায্যে যা করবার তুমিই কর না।'

'তুমি করবে না ?'

'না। ওসব ঝঞ্ঝাট আমি পোয়াতে পারব না। তুমের জন্যে আমারও চিন্তা হচ্ছে কিন্তু আমি ও নিয়ে মাতামাতি লাফালাফি করতে পারবো না। আমি জানি, সে ভালো আছে। খারাপ থাকলে একটা খবর নিশ্চয় আসত। তোমার ছেলেকে চেন না? কিছু একটা নিয়ে মত্ত হয়ে আছে সে। তাই চিঠি লিখছে না। আবার যখন খেয়াল হবে লম্বা লম্বা চিঠি লিখবে।'

পারুলবালা রুষ্ট মুখে ঈষৎ বেঁকে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাবপর আর কিছু না বলেই নেমে গেলেন নিচে।

সেইদিনই বিকেলবেলা সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা হল নবীন দত্তের। বাপেব বাড়ি থেকে ফিরেই সে এসেছিল নবীন দত্তের চিলে কোঠায়। সাবিত্রী মনে মনে আধুনিকা, অর্থাৎ আধুনিক যুগের চাল-চলনের স্রোতে ভাসতে চায়। যখন বিয়ে হয় নি, তখন ভেসেছিল। কিন্তু বিয়ের পর নবীন দত্তের আওতায় এসে দমে গিয়েছিল বেচারী। বুদ্ধিমতী মেয়ে, বুঝতে পারলে এ বাড়িতে থেকে নবীন দত্তের প্রবল ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষা করা শক্ত। যে লোকটা কারো কাছ থেকে কিছু চায় না, বরং সব্বাইকে যথা-সম্ভব দিতেই চায়, তাকে সমীহ করতেই হয়। সাবিত্রী মনে মনে সত্যিই শ্রদ্ধা করত নবীন দত্তকে। কারণ সে বুঝেছিল নবীন দত্ত বাইরে প্রাচীনপন্থী হলেও সত্যিই আধুনিকতা-বিরোধী নন। তিনি ছিলেন উন্নাসিকতা-বিরোধী। আধুনিকতার স্বাভাবিক প্রকাশকে ভদ্র মন নিয়ে শ্রদ্ধা করেন তিনি। চটে যান ঢং দেখান। সাবিত্রী অসাধারণ রূপসী। ঐ রূপের জন্যই পারুলবালা তাকে পছন্দ করে বিয়ে দিয়েছিলেন অলঙ্কারের সঙ্গে।

নবীন দত্ত

সাবিত্রীর কুলে কোথায় কি যেন একটা খুঁত ছিল, নবীন দত্ত দোনোমোনো করছিলেন বিয়ে দেবেন কি না, কিন্তু পারুলবালার জেদই জয়ী হয়েছিল শেষকালে। অলঙ্কারও মুগ্ধ হয়েছিল সাবিত্রীকে দেখে। অতি-বড় রূপসীকে বউ করে এনে নবীন দত্ত মনে মনে একটু ভীত ছিলেন। বি. এ. পাস করে বিয়ে হয়েছিল তার। ইচ্ছা ছিল ইউনিভারসিটিতে এম. এ. পড়ে। অনার্স পেয়েছিল বি. এ.তে। জীবন দত্ত আপত্তি করেছিলেন। বলেছিলেন ঘরের বউয়ের আবার ডিগ্রি নিয়ে কি হবে। তবে বাড়িতেই যত ইচ্ছা পড়াশোনা তুমি করতে পার। আমিই তোমাকে সাহায্য করব। তুমি বাড়িতে বসেই এম.এ.র কোর্সটা পড়ে ফেল না। সাবিত্রী তা পড়ে নি। নভেল নাটক পড়েছিল যথেষ্ট। কিছু কিছু কমিউনিস্ট সাহিত্যও। এ সবের জন্যে নবীন দত্তের সাহায্য নিতে হয় নি। তারপর হঠাৎ বিধবা হল সে। পরিবারে একটা আকস্মিক বজ্রপাত হল যেন। মানুষটা তো গেলই, সঙ্গে সঙ্গে অনেক টাকার আয়ও চলে গেল। শোকের ঝড়টা যখন প্রশমিত হল তখন সাবিত্রী একদিন নবীন দত্তকে বলল - 'আমি একটা চাকরি যোগাড় করেছি। আপনি অনুমতি দেন তো সেটা নিয়ে নি। মাইনে দু'শ টাকা।'

নবীন দত্ত বিস্মিত হলেন।

'কি করে চাকরি যোগাড় করলে তুমি —'

'আমার বাবার এক বন্ধু করে দিয়েছেন। একা আপনার উপরই বড্ড চাপ পড়েছে। তার উপর দিদিমা-ও এসে রয়েছেন। ঠাকুরপোর পড়া এখনও শেষ হয় নি। তাই ভাবলুম আপনি যদি আপত্তি না করেন চাকরিটা নি—'

খবরটা শুনে নবীন দত্ত খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বুদ্ধিমান যুক্তিবাদী লোক। আপত্তি করলেন না। সাবিত্রী চাকরি করতে লাগল। কিন্তু নবীন দত্তের মনের নেপথ্যে যে ভয়টা অশরীরী হয়েছিল এতদিন, সেটা শরীরী হয়ে আত্মপ্রকাশ করল। পথে গুণ্ডার হাতে পড়ল সাবিত্রী। সেইদিন থেকে সাবিত্রীর চাকরি খতম করে দিলেন নবীন দত্ত। তিনি বুঝলেন, এ গুণ্ডার দেশ, ছোটলোকের দেশ, এখানে দেবতারা বিহার করেন না, নারীরাও পূজা পায় না। একদা বেথুন কলেজের গাড়িতে যে সংস্কৃত শ্লোকটা কর্তারা লিখিয়াছিলেন সেটা এ দেশের পক্ষে হাস্যকর, বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো।

সাবিত্রীকে দেখে সোজা প্রশ্ন করলেন—'শুনলাম তুমি আবার চাকরি নিচ্ছ।'

মাথা হেঁট করে সাবিত্রী বলল--'হ্যাঁ, নিয়েছি। একটা স্কুলের হেড মিস্ট্রেস-গিরি। নতুন স্কুল হয়েছে, আমাকেই সেটা ভালো-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—'

'স্কুলের নাম কি।'

'জগন্মাতা বালিকা বিদ্যালয়। খগেশ্বরবাবুই স্থাপন করেছেন এটি নিজের মায়ের নামে। সব খরচ তাঁরই। স্কুলের বাড়ি করে দিয়েছেন, হেড মিস্ট্রেসেরও বাড়ি করে দিয়েছেন। আপনার ছেলের তো সহপাঠী উনি, তাই আমাকে চিঠি লিখেছিলেন যে আপনি আপাতত এসে স্কুলটার ভার নিন। আমি গিয়েছিলাম। মিস্টার হাজরা বললেন- আপাতত আমরা নিচের দিকের কয়েকটা ক্লাস আরম্ভ করছি। আস্তে আস্তে বড় করব। আপনি এসে এদের ভার যদি নেন আপনাকে মাসে তিনশ' করে দেব। সেটা বেড়ে

বেড়ে ক্রমশ পাঁচশ হবে। তাছাড়া ফ্রি কোয়ার্টার্স্। আর আমি যদি ওখানে গিয়ে না থাকি তাহলে মোটরে করে নিয়ে যাবেন, আবার পৌঁছে দেবেন।'

'তুমি কি কোয়ার্টার্সে থাকবে ঠিক করেছ?'

'আমি কিছুই ঠিক করি নি। আপনি যা বলবেন তাই করব।'

'খগেশ্বরের সঙ্গে দেখা করবার আগে তো আমাকে জিগ্যেস কর নি। করলে আমি আপত্তি করতাম না। নিজের আত্মসম্মান বাঁচাবার জন্যেই করতাম না। আজকাল সকলেই স্ব-ইচ্ছায় চলতে চায়, চলতে পারলে তো ভালই, আপত্তি করবার কি আছে। অলঙ্কার যদি বেঁচে থাকত তাহলে সে কি করত তা জানি না। না, আমার কিছুতেই আপত্তি নেই। তুমি যা ভালো বোঝ তাই কর।'

সাবিত্রী কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে বসে রইল।

তারপর বলল—'কোয়ার্টার্সে থাকাই সুবিধা। রেবতী পার্বতীকেও ওই স্কুলে ভরতি করে দেব। আমি একটা কথা বলছিলাম—'

একটু ইতস্ততঃ করে থেমে গেল সাবিত্রী।

'কি কথা—'

'আপনি আর মা-ও গিয়ে যদি থাকতেন ওখানে বড় ভালো হত। দোতলা বাড়ি। কিছু কষ্ট হত না আপনাদের। এ বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দিলে আরও শ পাঁচ ছয় টাকা আয়ও বাড়ত আমাদের—'

'না। তা পারব না। তুমি আলাদা থাকতে চাও, থাক গিয়ে। আমরা যাব না। চিরকাল স্বাধীনভাবে থেকেছি, বুড়ো-বয়সে কারো আওতায় থাকতে পারব না।'

সাবিত্রী বলল—'আপনি কিন্তু টিউশনি করতে পারবেন না।'

'কি নিয়ে থাকব তাহলে। সারাজীবন ছেলে পড়িয়ে এসেছি। যতক্ষণ শক্তি থাকবে ছেলেই পড়াব। আর জিনিসপত্রের দাম যা বাড়ছে ক্রমশ পেন্সনে আর কুলোবেও না। তাছাড়া, ভাগ্নেটা আছে, সে মানুষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে টাকা দিতে হবে। তুমি ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। মাথা ঘামিয়ে কেউ কিছু করতে পারে না। যা হবার তাই হয়।'

নবীন দত্ত উঠে জামা গায়ে দিতে লাগলেন।

'কোথায় যাবেন এখন—'

'অনেক জায়গায় যেতে হবে। প্রথমে যেতে হবে লাইব্রেরিতে।'

সাবিত্রী বলল—'আমি তাহলে চাকরিটা নিই।'

'নাও।'

'আপনি রাগ করছেন না তো বাবা।'

'কিছুমাত্র না। রাগ করব কেন?'

কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরে যে উত্তাপ বিকিরিত হল তা তিনি গোপন করতে পারলেন না।

সাবিত্রী প্রণাম করে নেমে গেল নিচে।

৫

নবীন দত্তের দিন কেটে যাচ্ছিল। এ যুগে যেমনভাবে কাটা সম্ভব তেমনি ভাবে কাটছিল। অগ্নিমূল্য খাদ্যদ্রব্য কিনেও তাঁর কুলিয়ে যাচ্ছিল, কারণ বাড়িতে তিনি আর পারুলবালা ছাড়া আর কেউ ছিল না। বারো টাকা কে জি পাকা পোনা, আর সাড়ে তিন টাকা কে জি সরু চাল কেনা অসম্ভব হচ্ছিল না তার পক্ষে। কারণ দুজনে আর কত খাবে! তবু দৈনিক দশ বারো টাকা খরচ। মুখপুড়ি এখনও রোজ আসে। সেই বাজার করে। পারুলবালার রান্নার সাহায্যও করে। পারুলবালা তাকে পর মনে করেন না। মাঝে মাঝে শাড়ি সেমিজ কিনে দেন তাকে। একটা আংটিও কিনে দিয়েছেন। নগদ টাকা দিতে সংকোচ হয়

তাকে। নবীন দত্তও মনে মনে শ্রদ্ধা করেন মুখপুড়িকে, কিন্তু তার সঙ্গে খুব বেশী মাখামাখি করাটাও পছন্দ করেন না তিনি। অথচ মুখপুড়ি পারুলবালার অন্তরঙ্গ—সে অন্তরঙ্গতায় ফাটল ধরাবার সাধ্য নেই তাঁর, বাসনাও নেই। বরং মাঝে মাঝে মনে হয় তাঁর—আহা, আমি যদি কারো সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে পারতাম। পারলে এমন নিঃসঙ্গ হতে হত না আমাকে। মাঝে মাঝে মনে হয় ছেলে হুটো কাছে থাকলে বোধহয় তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হত। কিন্তু বিধাতা বাদ সাধলেন। অলু মরে গেল, হুম সরে গেল। হুমের খবর এসেছে। সে অপরূপ কয়েকটা রঙীন ফোটো পাঠিয়েছে। তার সঙ্গে একটা চিঠিও লিখেছে—জার্মান ফার্মের চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। বেলের সম্বন্ধে যে সব তথ্য বার করে-ছিলাম তা ওদের বিক্রি করে দিয়ে মোটা টাকা পেয়েছি। পরের তাঁবেদারি করতে ভালো লাগল না। যদি কোনওদিন নিজের ল্যাবরেটরি করতে পারি আবার গবেষণা করব। আমার তোলা কয়েকটা ফোটো এখানকার একটা কাগজ ছেপেছিল। ভালো পয়সা দিয়েছে। আমার ফোটো সুখ্যাতিও অর্জন করেছে। শুধু তাই নয়, গুণগ্রাহীও হয়েছে হু' একজন। বিশাল সম্পত্তির অধি-কারিণী এক ধনী কন্যারও ফোটোগ্রাফির দিকে খুব ঝোঁক। তিনি আমার ফোটো দেখে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন এসে। পৃথিবীতে যেখানে যত 'বিউটি' আছে সে সবের ফোটো তোলবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে তাঁর। আমাকে সঙ্গে নিয়ে পৃথিবী ভ্রমণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমি ভাবছি এ সুযোগ ত্যাগ করব না। তিনি এজন্য আমাকে মাসে যে হাত খরচ দিতে চাইছেন তার পরিমাণ মাসে দশ হাজার টাকা। মেয়েটির বাবা

আমেরিকার একজন বড় বিজনেস্ ম্যাগনেট। মেয়েটি তাঁর একমাত্র সন্তান। জার্মানিতে ফোটো তুলতেই এসেছে। আমার সঙ্গে আকস্মিক যোগাযোগ হল। এ ধরনের মেয়ে আমাদের দেশে দেখি নি। হার্ভার্ডের এম. এ.। চার পাঁচটা ভাষা জানে। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলি গড় গড় করে মুখস্থ বলতে পারে। আমার কাছে বাংলা শিখতে চাইছে। মেয়েটির উৎসাহ প্রবল বন্যার মতো। তাবলে ভেবো না ওর তোড়ে আমি ভেসে গেছি। তবে মেয়েটিকে ভালো লেগেছে। ও যদি আমাকে সত্যিই ওর সঙ্গে পৃথিবী ভ্রমণে নিয়ে যায়, আমি যাব ওর সঙ্গে। কারণ এ সুযোগ জীবনে আর দ্বিতীয় বাব পাব না। তোমরা আশা করি ভালো আছ। দিদিমা কেমন আছেন? তোমাদেব জন্য আরও কিছু টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করছি আমি। তুমি বিশ্রাম নাও। অথোপার্জনের জন্য শরীরপাত করবার দরকার নেই। মাকে চিঠি লিখতে বোলো। আমার নূতন ঠিকানাটা নিচে লিখে দিলাম। এই চিঠির কাগজে যে হোটেলের ঠিকানা ছাপা আছে, সে হোটেল আজই আমি ছেড়ে দেব। নূতন ঠিকানায় কাল চলে যাব। এই ঠিকানাতেই চিঠি দিও। বৌদি, রেবতী, পার্বতী, মুখপুড়ি দিদি কেমন আছে? বৌদিকে আবার একটা চাকরিতেই লাগিয়ে দাও। ঘরে চুপচাপ বসে কি করবে। রেবতী পার্বতীকে ভালো একটা বোর্ডিংয়ে দিয়ে দাও। তুমি মা ও বৌদি আমার প্রণাম জেনো। পার্বতী রেবতীকে আশীর্বাদ দিও। ইতি প্রণত তুম্

চিঠিখানা পড়ে নবীন দত্তের মনে যে প্রতিক্রিয়া হল তার মূলে নিহিত আছে নিদারুণ অভিমানে, যে অভিমানের ছবি কবিরা

নানা বর্ণে এঁকেছেন বিরহী প্রেমিক-প্রেমিকার মনস্তত্ত্বকে কেন্দ্র করে। নানা রকম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন তাঁরা। নবীন দত্তের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিক্রিয়াটা অদ্ভুত রকম হল। তিনি সোজা গিয়ে জার্মানীতে হুমকে একটা 'কেব্‌ল' (cable) করলেন। Thanks. Need not send money. Nabin Dutta.

নবীন দত্ত পারুলবালাকে জানান নি যে তিনি টাকা পাঠাতে মানা করেছেন। পারুলবালা চিঠিখানা পড়ে চুপ করে রইলেন। চুপ করে থাকাই তাঁর স্বভাব। নীরবতাই তার একমাত্র ব্যক্তিত্ব। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো তাঁর চিন্তাধারা লোকচক্ষুর অগোচরে থাকে। কল্পনা করতে লাগলেন হুম টাকা পাঠালে তিনি একটা বালুচরী শাড়ি কিনবেন, আর কিনবেন নবীন দত্তের জন্যে একটা ভালো কাশ্মীরী শাল। লোকটা ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরেই সারা জীবনটা কাটাল। শেষ বয়সে একটু ভালো জামা-কাপড় পরুক না। একটা গরদের পাঞ্জাবি এবং তাঁতের ভালো ধুতিও কিনে দেবেন ঠিক করলেন তিনি। কিন্তু হুম্‌ কবে আসবে? এক মেম ছুঁড়ির কথা লিখেছে, শেষে ওকে বিয়ে টিয়ে করবে না তো! তা যদি করে তাহলে তো তাঁর সব সাধ-আহ্লাদ শেষ হয়ে গেল। ও মেমকে নিয়ে যদি এদেশে আসেও তাহলে বাঙালী মায়ের সাধ-আহ্লাদ মেম-বউ মেটাতে পারবে না। ভালো হলেও পারবে না। কেক কখনও সন্দেশের স্বাদ মেটাতে পারে? লজ্জা বলেছিল (লজ্জা তাঁর মেয়ে, প্রতাপের মা) তাদের পাড়ায় একটি ছেলে বিলেতে গিয়ে মেম-বউ এনেছে। বউটি ভালো মেয়ে। সুক্তো চচ্চড়ি খেয়ে বাঙালী

সংসারে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না কিছু-তেই। তেল ক্রমাগত ভেসে উঠছে জলের উপর। মিশছে না। ছেলেটি ডাক্তার। বউকে নিয়ে বিলেতেই চলে যাবে ঠিক করেছে শেষ পর্যন্ত। ছেলের মা বোনেরা প্রথম প্রথম গদগদ হবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে নি। অনেক গাদ ও খাদ বেরিয়ে পড়েছে না কি। পারুলবালা নীরবে ভাবেন খালি। নবীন দত্ত তাঁর ভাবনার অংশ নেন না। নিতে চান না, নিতে পারেনও না। পারুলবালা তাই তাঁর কাছে প্রায় চুপ করেই থাকেন। নবীন দত্ত তুবেলা তাঁব কাছে খেতে আসেন অবশ্য। তুমের কথা কিছু বলেন না। খানও অন্যমনস্ক হয়ে। সেদিন হঠাৎ ভাজা মুগের ডালের প্রশংসা করেছিলেন। পারুলবালা মায়ের সেবা করছিলেন যতদিন ততদিন মাছ খান নি। নবীন দত্তও মাছ খেতেন না। ইদানীং কিন্তু পারুলবালা মাছ কিনছেন আড়াই শ' গ্রাম করে। মুখপুড়ি তাঁকে বলেছে সধবা মানুষের নিরামিষ খাওয়া স্বামীর পক্ষে অমঙ্গলজনক। একটু আঁশমুখ করতেই হবে সধবার।

ইদানিং খরচ কিছু কমেছে, তাই মাছ কিনছেন পারুলবালা। নবীন দত্ত মাছের ঝোল খুব ভালোবাসতেন। একদিন হঠাৎ বললেন, 'আমাকে মাছ খাইয়ে লোভী করে তুলছ। পয়সার টানাটানি হলে মহাকষ্টে পড়ে যাব। অভ্যস্ত জিনিস পাইলে সুখ নাই, না পাইলে তুঃখ—বলে গেছেন একজন মস্ত বড়লোক।' এর উত্তরে পারুলবালা সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিলেন না। তার-পর বললেন—'পয়সার টানাটানি হবে কেন, তুম্ অত রোজ-গার করছে। সেই খরচ চালাবে।'

'ওর টাকা আমি নেব কেন।'

'নেবে না-ই বা কেন।'

'নিলে স্বস্তি পাব না। কারো হাত-তোলা হয়ে থাকি নি কখনও। নেবার দরকারও তো নেই। লক্ষ্ণৌতে আর টাকা পাঠাতে হবে না। দেবনাথ পাশ করে চাকরি পেয়েছে একটা। ভালো ছেলে দেবু। লিখেছে আপনি ও মাসীমা আমার কাছে এসে থাকুন।'

পারুলবালা দেবনাথের উপর খুব প্রসন্ন ছিলেন না। যখন এ বাড়িতে বধূ হয়ে এসেছিলেন তখন তার মা কালী তাঁকে ভারী জ্বালিয়েছিল। দেবনাথ হওয়ার অনেক দিন পর পর্যন্ত বাপের বাড়িতে ছিল কালী। স্বামীর একটু বার-টান ছিল বলে ঝগড়া-ঝাঁটি করে চলে এসেছিল। নবীন দত্তের মা সর্বাঙ্গসুন্দরী (লোকে সংক্ষেপে বলতো—সর্ব-ঠাকরুন) যেতে দেন-নি মেয়েকে তখন। দেবুর তখন বছরখানেক বয়স। তুমের বয়স তখন তিন বছর, অলুর পাঁচ বছর। দেবুর সঙ্গে ওদের কি যে পক্ষপাতিত্ব করতেন মা তা আজও পারুলবালার মনে আছে। দেবুকে আলাদা ফলের রস খাওয়ানো হত, দুধ ছাড়া আলাদা হরলিক্সও কিনে দিতেন ওকে। কালী পারুলবালার নামে গোপনে নানারকম লাগান-ভাঙান করত, ফলে নানারকম লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করতে হয়েছে পারুলবালাকে। মা এখন কাশীবাস করছেন, কালী মারা গেছে, পারুলবালা কিন্তু কিছু ভোলেন নি। কালীর ননদ বিশাখা মানুষ করেছিল দেবনাথকে। বিশাখা সম্বন্ধে পারুলবালার ধারণা ভালো। মেয়েটা দজ্জাল কিন্তু খারাপ নয়। দেবনাথকে নবীন দত্ত মাসে মাসে টাকা দিচ্ছিলেন এতে আপত্তি করেন নি

পারুলবালা। তবে তাঁর মনে হয়েছিল নিজে না খেয়ে ময়লা জামা-কাপড় পরে বুড়ো বয়সে টিউশনি করে ভাগ্নেকে টাকা পাঠানোর কোনও মানে হয় না। এসব মনে হয়েছিল, কিন্তু কিছু বলেন নি। নবীন দত্তের কোনো আচরণেরই প্রতিবাদ করেন নি তিনি কখনও। নবীন দত্ত তাঁর রুগ্না মাকে এনে আশ্রয় দিয়েছিলেন এটাও তো ভুলতে পারেন না তিনি। তিনি নবীন দত্তকে ভয় করেন, ভক্তি করেন আর সব সময়ে বুঝতেও পারেন না। বুঝতে না পারলেও অবোধের মতো তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। ওইটেই অভ্যাস হয়ে গেছে। হুমের টাকা নেবেন না একথা শুনে মনে মনে ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হল না। চুপ করেই রইলেন। একটা কথা তিনি মনে মনে ভালো করেই জানেন হুম্ তাঁরও ছেলে। হুমের উপর তাঁর অধিকারও কিছু কম নয়। জানেন, কিন্তু সে কথা বললেন না।

নবীন দত্ত দুপুরে খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে গেলেন। গেলেন রাখালের খোঁজে তার দোকানে। প্রতি রবিবারে এসে তার হিসাবপত্র দেওয়ার কথা। কয়েক সপ্তাহ থেকে সে আর আসছে না। দোকানে গিয়েও তাকে পান নি। একটা ফড়ে গোছের ছোঁড়া বসে থাকে, সে দরকারি কথার জবাবে কেবল বলে—জানি না। রাখাল কোথায় জানতে চাইলে বলে, জানি না। কখন দোকানে আসবে জিজ্ঞেস করলেও বলে, জানি না। এই জানি না—মার্কা ছোকরাকে সেদিন গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ছাপাখানা থেকে বই ছেপে এসেছে? এর উত্তরেও সে যথারীতি বললে জানি না,

তখন নবীন দত্ত বললেন, তুমি কিছুই যখন জান না, তখন এ দোকানে বসে কি করছ তুমি ? তাকের উপরে রাখা একটি ছোট গণেশমূর্তিকে দেখিয়ে বললে—ওইখানে ধূপ জ্বেলে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিই আর পাহারা দিই। নবীন দত্ত দেখলেন একটা ছোট্ট কাচের টেবিলের সামনে একটা টিনের চেয়ার রয়েছে। ছোঁড়াটা সিঁড়ির একধারে বসে। তার আশপাশে অসংখ্য বিড়ির টুকরো। রাখাল ঠিকই বলেছিল, জায়গাটা নরক-কুণ্ড বিশেষ। চারিদিকে আবর্জনার স্তূপ। পাশাপাশি আরও অনেকগুলো দোকান। সকলেরই ওই অবস্থা। কিন্তু আর সব দোকানের মালিকরা দোকানে বসে আছেন। রাখালই কেবল অনুপস্থিত। নবীন দত্ত ঠিক করলেন রাখাল যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ তিনি অপেক্ষা করবেন তার জন্য। সেই টিনের চেয়ারে গিয়ে বসলেন তিনি। লক্ষ্য করতে লাগলেন সামনের দোকানের ছোকরা-টিকে। সেও মাঝে মাঝে তার দিকে চাইছিল। হঠাৎ ছোকরাটি দোকান থেকে নেবে এসে নমস্কার করে প্রশ্ন করল—'আপনিই কি অধ্যাপক নবীন দত্ত ?'

'হ্যাঁ ঃ কেন—'

'রাখালবাবু আপনার নোট ছাপছেন ?'

'ছাপাব বলে তো এনে রেখেছে অনেকদিন। ইদানিং তার কোন খবরই পাচ্ছি না, তাই নিজেই এলাম।'

'তাঁকে আর বিকাশবাবুকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।'

'কেন ?'

'নকশাল সন্দেহ করে।'

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন নবীন দত্ত।

ছোকরাটি তখন ইতস্ততঃ করে বলল 'আমরাও নোট ছাপি। আপনার নোটের ম্যানাস্‌ক্রিপ্ট কি রাখালবাবুর কাছে?'

'হ্যাঁ।'

ছোকরাটি কেমন যেন রহস্যময় ভাবে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। তারপর বলল—'তাহলে তো উদ্ধার হওয়া শক্ত।'

উঠে পড়লেন নবীন দত্ত। উঠে বই-পাড়া দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। হঠাৎ একটা দোকানে চোখে পড়ল—হ্যামলেট সাজানো রয়েছে অনেক। আর বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—নোটস বাই প্রঃ এন. দত্ত। দাঁড়িয়ে পড়লেন। প্রফেসার এন. দত্ত কে আবার? একখানা বই চেয়ে নিয়ে দেখলেন। এ তো তাঁরই নোট। দেখলেন ছেপেছে সেই সামনের দোকানের ছেলেটি। তার দোকানের উপর সাইন্‌বোর্ডে যে নাম ঝুলছিল এ তো সেই নাম। থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। ভাবলেন একবার গিয়ে জিগ্যেস করেন এ নোট তোমরা পেলে কোথা থেকে। কিন্তু হঠাৎ নিদারুণ বিতৃষ্ণায় মনটা ভরে গেল তাঁর। তিনি হনহন করে হেঁটে বেরিয়ে গেলেন। মনে হতে লাগল—চোর, চোর, চোর, সব চোর। ওই রাখালটি ওর সঙ্গে সড় করেছে। কিন্তু রাখালকে চোর বলে মনে হয় নি তো তাঁর। বিকাশকেও না। দুজনেই তাঁর ছাত্র, অনেকদিন ধরে দেখছেন তাদের। ওরা চোর? কলেজ স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে মির্জাপুর স্ট্রীটে পড়লেন। হঠাৎ এক পুরাতন বন্ধু ব্রজেন চাটুজ্যের সঙ্গে দেখা। পাইকপাড়ায় যখন থাকতেন তখন ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী ছিলেন। ভদ্রলোকের সাহিত্য চর্চার দিকে ঝোঁক ছিল। নিম্নলিখিত রূপ আলাপ হল।

ব্রজেন্দ্র। আরে নবীন বাবু যে। নমস্কার, অনেকদিন পরে দেখা

হল। খবর কি সব।

নবীন। দেবার মতো সুখবর কিছু নেই। সবই দুঃসংবাদ। এই-মাত্র আবিষ্কার করলাম – একজন প্রকাশক আমার হ্যামলেটের নোটটা চুরি করে ছেপেছে।

ব্রজেন্দ্র। ছাপবেই তো, এ যে চোরের দেশ মশাই। সাহিত্য ক্ষেত্রেও ওই ব্যাপার। পুকুর চুরি করছে সব। আমি একটা কয়লার দোকান করছি মশাই—রোজই কিছু না কিছু চুরি হচ্ছে। চোর ধরবার জন্যে ওই কয়লাগাদার উপর দিনরাত বসেই বা থাকি কি করে বলুন! আচ্ছা চলি, হাওড়া যেতে হবে। কয়লার ওয়াগন এল কি না খোঁজ নিতে যাচ্ছি। কয়লা এসেছে কিনা এই খবরটি জানবার জন্যেও কিছু ঘুষ দিতে হয়। কোথায় আছেন মশাই আপনি! ঊর্ধ্বে অধে সম্মুখে পশ্চাতে, লড়াই করুন খালি ছ্যাঁচোড়ের সাথে। আচ্ছা চলি। নমস্কার।

নবীনবাবু হাঁটতে হাঁটতে একটি কথাই ভাবতে লাগলেন কেবল --হেরে যাব? শেষকালে হার মানতে হবে? চোখের উপর বিদ্যাসাগরের ছবিটা ভেসে উঠল। তাঁকে প্রশ্ন করলেন— আপনার জীবনীতে পড়েছি আপনার বাবা কাশী যাবার আগে না কি স্বপ্ন দেখেছিলেন আপনার বাড়ি শ্মশান হয়ে যাবে। খবরটা ভুল না তো, তিনি হয়তো দেখেছিলেন বাংলা দেশটাই শ্মশান হয়ে যাবে। বিদ্যাসাগরের ছবি যেন উত্তর দিলেন—কোন শ্মশানও বেশী দিন শ্মশান থাকে না হে।

বাড়ি ফিরে এসে দেখেন রাখাল শুষ্কমুখে বসে আছে। সে তাঁর পা জড়িয়ে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল।

'সবনাশ হয়ে গেছে আমার, সর্বনাশ হয়েছে—'

'ওঠ, ওঠ, পা ছাড়—ব্যাপার কি ?'

একটা পুঁজে-ভরতি ফোঁড়া হঠাৎ ফেটে গেলে যে রকম আরাম হয় নবীন দত্ত সেই রকম একটা আরাম অনুভব করলেন। রাখাল তাহলে চোর নয়। চোর হলে ফিরে আসত না।

রাখাল আত্মস্থ হয়ে বসল অনেক কষ্টে। তবুও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কোন কথাই বলতে পারল না খানিকক্ষণ। মাথা হেঁট করে বসে রইল খালি। নবীন দত্তই প্রশ্ন করতে লাগলেন।

'তুমি এলে কোথা থেকে ? আমি একটু আগে তোমার দোকানে গিয়েছিলাম। দেখলাম দোকানে যে ছোড়াটা বসে আছে সে তো কিছুই জানে না।'

রাখাল চুপ করে বসে রইল।

'আমি কিন্তু কিছু খবব নিয়ে এসেছি। তোমাব সামনে যে দোকানদারটা আছে সে বললে তোমাদেব নকশাল সন্দেহ করে না কি পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। ফিবে আসছিলুম, হঠাৎ চোখে পড়ল একটা দোকানে হ্যামলেটের নোট স্তূপীকৃত করা আছে। গ্রন্থকার প্রফেসার এন-দত্ত। একটা বই নিয়ে খুলে দেখলাম—সব আমারই নোট। ছাপিয়েছে ওই সামনের দোকানদারটা। এ কি করে সম্ভব হল ?'

রাখাল তবুও নীরব।

'ব্যাপারটা কি খুলে বল না। চুপ করে আছ কেন ?'

'প্রথম কারণ আমরা গরীব। দ্বিতীয় কারণ কতকগুলো ধনী জুয়াচোর আমাদের ঠকাচ্ছে। আমরা কোন প্রতিকার করতে পারছি না।'

'ও সব তো সব দেশে চিরকাল হয়। তোমার কি হয়েছে তাই বল।'

'আমি বইটা প্রথমে যে প্রেসে দিয়েছিলাম সেখানে শস্তা বলেই দিয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম সেখানে নির্ভুল ছাপা হওয়া অসম্ভব। আপনি রাগ করতে লাগলেন। তখন ওই সামনের দোকানদারটি বললে—আমাকে দিন, আমি নির্ভুল করে ছেপে দেব। আমাদের প্রেস আছে। ভালো প্রুফ-রীডারও আছে। আপনি ও প্রেসে যে রেট দিচ্ছেন সেই রেটেই আমরাও ছেপে দেব। বিশ্বাস করে দিয়ে দিলাম তাকে ম্যানাসক্রিপট। কোন রসিদও নিলাম না। তার দু'চার দিন পর পুলিশ এসে হাজির একদিন। বলল—লালবাজার যেতে হবে। গেলাম। সেখানে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখে, তারপর জেরা শুরু করলে। অফিসারটি ভালো লোক ছিলেন, তিনি আমাদের ছেড়ে দিলেন। কিন্তু তারপর থেকেই সন্দেহ হচ্ছে স্পাই আমাদের পিছনে লেগেই আছে। আর এটাও এখন বুঝতে পেরেছি ওই সামনের দোকানদারটির সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে ওই স্পাইটির। একদিন দোকানে যাওয়ার ঠিক পরেই সামনের দোকানে এসে বসল। আমি যতক্ষণ রইলাম ততক্ষণ বসে রইল। তারপর আমরা যেই দোকান থেকে নামলাম সে-ও উঠে পড়ল। দেখলাম আমার পিছু পিছু আসছে। যতক্ষণ বাড়িতে থাকি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। বিকাশ কানপুরে চলে গেছে। সেখানে তার কাকা বড় পুলিশ অফিসার। সে আমাকে চিঠি লিখেছে, তুই লালবাজারে গিয়ে সেই অফিসারটির সঙ্গে দেখা কর। দেখা করেছিলাম। তিনি বললেন—আপনি দু'একজন গণ্যমান্য লোকের কাছ থেকে গুড্ ক্যারেক্টার

সার্টিফিকেট নিয়ে আসুন। একটা সার্টিফিকেট হলেই হবে। কোন গভর্নমেণ্ট অফিসার, বা প্রফেসর, বা নামজাদা ডাক্তার— এই ধরনের লোক হওয়া চাই। আপনি সার, আমাকে একটা সার্টিফিকেট লিখে দিন।'

নবীন দত্ত বললেন—'আমি তো গণ্যমান্য লোক নই। আমার সাটিফিকেটে কাজ হবে না। তাছাড়া আমি তোমার কতটুকু জানি বল ? তোমাকে কলেজে পড়িয়েছি, এই জানি। তোমার ক্যারেক্টার সম্বন্ধে কিছুই জানি না। তুমি কোন পলিটিক্যাল নেতার কাছে যাও। তাঁরাই আজকাল গণ্যমান্য। পুলিশের কাছে তাঁদের কথারই ওজনও আছে—'

'আমি তো কাউকেই চিনি না সার।'

চুপ করে বসে রইল রাখাল।

'তোমার মতলবটা কি বল দেখি—'

'আপনি আমার ব্যবস্থা করুন একটা সার। আমাকেকেউ চেনে না, আমার বাবা গরীব কেরানী—'

আবার তার গলার স্বর কাঁদ-কাঁদ হয়ে এল।

'আমি কি করব। এ তো মহা মুশকিলে ফেললে দেখছি? খেয়ে এসেছ?'

'না। সকাল ন'টায় খেয়ে বেরিয়েছি। রাত্রে আবার ফিরে গিয়ে খাব।'

'সেই স্পাইটা কোথায়?'

'আপনার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে বোধহয়।'

'এ তো মহা বিপদ দেখছি।'

ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন তিনি হতভাগা ছেলেটার দিকে।

ভয়ানক রাগ হল। ইচ্ছে হল ঠাস ঠাস করে চড়িয়ে দূর করে দেন তাকে। হঠাৎ বিদ্যাসাগরের ছবিটা চোখে পড়ল। মুখে মৃদু হাসি, চোখ দুটি করুণায় ভরা। হন হন করে নিচে নেমে গেলেন। দেখলেন মুখপুড়ি কুটনো কুটছে। পারুলবালা রুটি বেলছেন।

'আমার একটি ছাত্র এসেছে। কিছু খাবার পাঠিয়ে দাও তো।'

তিনি বুঝলেন এ সময় খাবার দেওয়া অসুবিধাজনক।

তবু বলে চলে এলেন। একটু পরে মুখপুড়ি এক প্লেট গরম সিঙাড়া দিয়ে গেল।

'সিঙাড়াগুলো খেয়ে নাও। খেয়ে বাড়ি চলে যাও। আমার সার্টি-ফিকেটে কিচ্ছু হবে না।'

রাখাল নীরবে সিঙাড়াগুলি খেতে লাগল। সত্যিই খুব খিদে পেয়েছিল তার। নবীন দত্ত বিদ্যাসাগরের ছবির দিকে নির্নিমেষে চেয়ে বসে রইলেন। হঠাৎ রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল তাঁর। ওই ব্রাহ্মণকে এ দেশের লোকেরা সারা জীবন ঠকিয়েছে। দুহাতে তাঁর কাছ থেকে হাত পেতে নিয়েছে আর আড়ালে তাঁকে গাল দিয়েছে। বাড়িটা পর্যন্ত পুড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্বাসঘাতক পরস্ত্রী-কাতর বদমাইশের দল সব। এই ছোঁড়াটাও সেই সব রক্ত-বীজের বংশধর। এখন নাকে কাঁদছে সুযোগ পেলেই থুড়ি লাফ দেবে।

সিঙাড়াগুলো শেষ করে এক গ্লাস জল ঢকঢক করে খেয়ে ফেললে রাখাল।

'এবার বাড়ি যাও। আমার সার্টিফিকেটে কোনও লাভ হবে না। তাছাড়া তোমার ক্যারেক্টর কেমন তা আমি জানি না। সার্টি-ফিকেট দিতে পারব না।'

'আমি কি করব তাহলে সার।'—করুণকণ্ঠে বলল রাখাল। টপ টপ করে আবার জল ঝরে পড়ল তার চোখ দিয়ে।

'আমি কি করে বলি বল।'

হঠাৎ বিদ্যাসাগরের ছবিটার দিকে আবার চোখ পড়ল তাঁর। দেখলেন চোখ দুটি যেন জীবন্ত। করুণায় পরিপূর্ণ। আর তাতে অতি প্রচ্ছন্ন স্নিগ্ধ একটি হাসি। নবীন দত্ত এর থেকে কি বুঝলেন কে জানে। রাখালকে বললেন—'একটু বস তাহলে। ভেবে দেখি।'

ছাতে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। রাখাল ঘরের ভিতর চুপ করে বসে রইল।

মিনিট পনেরো পরে হঠাৎ ঘরের ভিতর ঢুকলেন নবীন দত্ত।

'হয়েছে, চল। যেতে হবে এক জায়গায়।'

তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়ে আর নতুন চপ্পলটা পায়ে দিয়ে পয়সার থলিটা পকেটে পুরে নিলেন। পারুলবালার জেদে নতুন চপ্পল কিনতে হয়েছিল এক জোড়া।

'চল।'

রাখাল উঠে অনুসরণ করতে লাগল।

রাস্তায় নেমে রাখাল জিগ্যেস করলে 'কোথায় যাবেন?'

'শিশুসমার কাছে। সে আমার ছাত্রী। সে কোন উপায় করতে পারে।'

ট্রামে করে কিছুদূর গিয়ে বাস ধরলেন একটা। শিশুসমার বাড়িতে পৌঁছলেন যখন, তখন আটটা বেজে গেছে। বাড়ির একতলার গেটে বিরাটকায় এক হিন্দুস্থানী দারোয়ান ছিল। সে বলল, 'মাঈজি আছেন।'

আগে কোন দারোয়ান ছিল না।

'খবর দিজিয়ে।'

'আভি খবর দেনা মনা হ্যায়। আপ লোগ বৈঠিয়ে। মাঈজি রেওয়াজ কর রহি হেঁ।'

নবীন দত্ত বললেন—'এক টুকরো কাগজ দিজিয়ে। হাম নাম লিখ দেতা হ্যায়। পোঁছা দিজিয়ে।'

দারোয়ান নবীন দত্তের ভাব-ভঙ্গী দেখে আর আপত্তি করতে সাহস করল না। কাগজ দিলো। নাম লিখে দিলেন নবীন দত্ত। সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে এল শিশুসমা। এসে প্রণাম করে বললে —'কাকাবাবু, খবর না দিয়ে এমন হঠাৎ এলেন যে—'

'চল ওপরে চল, বলছি।'

ওপরে গিয়ে দেখেন একটি বৃদ্ধ ওস্তাদ এবং একটি তবল্‌চি বসে আছেন। আর রয়েছে একটি সেতার এবং বাঁয়া-তবলা এক জোড়া। শিশুসমা বললে 'ওস্তাদজি, আজ কাকাবাবু এসেছেন, আজ আর বাজাব না। কাল আসবেন—'

ওরা চলে গেল।

'তুই গান বাজনা শিখছিস?'

'শুধু বাজনা। সেতারটা শিখছি। কি আর করি বলুন, কি নিয়ে থাকব। আপনি তো ভুলে গেছেন একেবারে'—রাখালকে দেখিয়ে বললে—'ইনি কে?'

'আমার একজন ছাত্র। তবে তোমার চেয়ে কয়েক বছর সিনিয়ার। বিপদে পড়েছে। তাই তোমার কাছে এসেছি। তোমার বাবা তো বড় পুলিশ অফিসার ছিলো। তোমার আলাপ আছে কোনও অফিসারের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ আছে। অনেকেই আমাকে ভালোবাসেন। আমার খোঁজ-খবর নিতে বাড়িতেও আসেন কেউ কেউ। কেন?'

'রাখাল বিপদে পড়েছে। দেখ, যদি উদ্ধার করতে পার।'

সব শুনে শিশুসমা বললে—'চেষ্টা করব। আমার মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে। কোনও প্রমাণ তো পায় নি আপনার বিরুদ্ধে?'

'না। কোনও নকশালের সঙ্গে আমার আলাপই নেই।'

'তাহলে ঠিক হয়ে যাবে।'

নবীন দত্ত বললেন—'তুমি তাহলে ওর ভার নিচ্ছ তো?'

শিশুসমা হেসে বললে,—'বেশ নিলাম।'

'আমি তাহলে চলি?'

'বাঃ, কিছু খেয়ে যাবেন না। বসুন—'

'বসছি একটু। কিন্তু খাব না কিছু। খেলে পারুলবালা রাগ করবে।'

'সে আবার কে?'

'তোমার কাকীমা। সে রেঁধে বেড়ে বসে আছে। এখন কিছু খেলে আর খেতে পারব না।'

৬

নবীন দত্তের দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু শান্তি ছিল না মনে। অর্থের অভাব আর ছিল না। বিনয় আর ভূপেনের বাড়ি গিয়ে তাদের পড়াবার ইচ্ছা আর ছিল না তাঁর। বস্তুত তাদের তিনি বলেই দিয়েছিলেন তাঁর আর তাদের পড়াবার যোগ্যতাই নেই। তারা নিজেরাই এত পড়াশোনা করেছে যে তার চেয়ে বেশী তিনি আর কিছু দিতে পারবেন না তাদের। তিনি অবান্তর হয়ে গেছেন। তাই তিনি তাদের চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন আমি আর যাব না। যানও নি। কিন্তু তারা নিজেরাই আসতে আরম্ভ করেছে, আর মাসে মাসে টাকা দিয়ে যাচ্ছে। নবীন দত্ত কিছুতেই তাদের নিবৃত্ত করতে পারছে না। তাঁর সন্দেহ হয়েছে

ওরা বোধহয় পড়ার ছুতোয় তাকে অর্থ সাহায্য করছে। অার্থৎ অনুগ্রহ করছে। অথচ রূঢ় হয়ে তাদের প্রত্যাখান করতে পারছেন না, এইটে তাঁর এক মহা অশান্তির কারণ হয়েছে। ছেলে দুটোকে ভালোবাসেন নবীন দত্ত, শ্রদ্ধাও করেন। তাই এদের উপর খুব রূঢ় হতে পারছেন না। আর একটা অশান্তির কারণ হয়ে উঠেছেন পারুলবালা। তিনি বলছেন আমি ছুমকে না দেখে আর থাকতে পাচ্ছি না। ছুম যদি এখানে না আসে তিনিই সেখানে যাবেন। তাঁকেও সঙ্গে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছেন। ছুম তার মাকে হাজার দশেক টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। ধনকুবের-নন্দিনী বান্ধবীটিই নাকি দিয়েছে টাকাটা। বলেছে, তোমার মা বাবাকে এখানে আনিয়ে নাও। পারুলবালা যাওয়ার জন্যে ব্যগ্র, নবীন দত্ত যাবেন না বলে দিয়েছেন। এ ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করেও একটা অশান্তির আগুন ধূমায়িত হচ্ছে। পারুলবালা মাঝে মাঝে শাসাচ্ছেন, তুমি যদি না যাও, আমি একাই চলে যাব। প্রতাপ আমাকে নিয়ে যাবে বলেছে। নবীন দত্ত 'না' বলেছেন, তবু পারুলবালা আশা করে আছেন তার 'না'কে 'হাঁ' করবেন তিনি। নবীন দত্তের প্রিয় তরকারিগুলি রোজ রেঁধে যাচ্ছেন। তাঁর হাতের রান্না অতি উত্তম, নবীন দত্ত চেয়ে চেয়ে খাচ্ছেন, কিন্তু আসল ব্যাপারে অনড় হয়ে বসে আছেন। ছুম তাঁকে আর চিঠি লেখে নি। ছুম চেনে তাঁকে। পারুলবালাও চেনেন, কিন্তু তাঁর ধারণা পাষাণকেও মোমের মতো গলিয়ে ফেলবার ক্ষমতা আছে তাঁর। তৃতীয় অশান্তি হয়েছে সাবিত্রীকে নিয়ে। অলঙ্কারের বন্ধু খগেশ্বর হাজরা একদিন এসেছিলেন তাঁর কাছে। এসে প্রণাম করে বললে—'আপনাকে আজ নিমন্ত্রণ

করতে এসেছি। আমাদের স্কুলে আপনি একবার পায়ের ধূলো দিন। এটা সকলের ইচ্ছে।'

'সকলের মানে?'

'আমাদের ওয়ার্কিং কমিটির—'

ওয়ার্কিং কমিটির যে সব সভ্যদের সে নাম বললে তাদের মধ্যে তাঁর চেনা দু' চারজন প্রফেসার ছিল। পরমেশও ছিল। শুনেই তাঁর মনটা কেমন বিষিয়ে উঠল। তিনি আন্দাজ করলেন সাবিত্রী আর খগেশ্বরকে নিয়ে তারা মনে মনে একটা ঘোঁট পাকাচ্ছে নিশ্চয়। তাঁর নিজের মনেও কি সন্দেহের ছায়াপাত হয় নি? চুপ করে রইলেন নবীন দত্ত।

'আপনি যেদিন যাবেন আমি মোটর নিয়ে আসব। মা-ও যদি যান, আরও খুশী হব আমরা।'

নবীন দত্ত সহসা প্রশ্ন করলেন।

'স্কুলের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?'

'আমিই স্কুলের মালিক। আমার মায়ের নামে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেছি। নিচের কয়েকটা ক্লাস এখন আরম্ভ হয়েছে, পরে ওটাকে হায়ার সেকেণ্ডারি পর্যন্ত করবার ইচ্ছা আছে—'

'টাকা সব তোমার?'

'হ্যাঁ। গভর্নমেণ্টের সাহায্য নিলে বাধ্যবাধকতার মধ্যে যেতে হয় তাই সে সাহায্য নিই নি।'

'ওরা এ ইস্কুল recognise করবে?'

'করেছে। না, করবার তো কোনও কারণ নেই। ওদের নিয়ম অনুসারেই তো সব হয়েছে। একজন মন্ত্রীও আমাদের স্কুলের পেট্রন হয়েছেন, আমাদের ইচ্ছে আপনিও একজন পেট্রন হন।'

'না, না, আমি ওসব দলে বেমানান। তুমি তো প্রফেসারি করছিলে, ছেড়ে দিয়েছ?'
'হ্যাঁ। আজকাল যা অবস্থা তাতে ভদ্রভাবে আত্মসম্মান বজায় রেখে প্রফেসারি করা যায় না। প্রফেসাররা আজকাল এক একটা রাজনৈতিক দলে ভিড়ে গেছেন। ইউনিভার্সিটিতেও আজকাল তোয়াজ-তদ্বির ধরাধরির ফালাও কারবার চলছে। তাই ওখানে থাকতে পারলাম না—'
'কি করছ আজকাল তাহলে?'
'একটা বইয়ের দোকান করেছি। আমাদের কয়েকটা বাড়ি থেকে আয়ও হয় কিছু—"
নবীন দত্ত জানতেন খগেশ্বর ধনীর একমাত্র সন্তান। তাই আর কিছু বললেন না।
যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল খগেশ্বর। খগেশ্বর ভালো ছেলে এবং অলঙ্কারের প্রিয় বন্ধু বলে তাঁর সম্বন্ধে দুর্বলতাও ছিল নবীন দত্তের। বললেন—'আচ্ছা, যাব একদিন। আসছে রবিবারে এসো।

রবিবারে গেলেন পারুলবালাকে নিয়ে। নাতনীদের দেখবার জন্যে উৎসুক হয়েছিলেন পারুলবালা। গিয়ে দেখলেন সাবিত্রী সুখেই আছে। নাতনীরাও। তাদের গায়ে দামী দামী জামা। মাথায় চকচকে ক্লিপ্। সাবিত্রীর ঘরে একটি ফ্রিজ আছে, দামী টেপ রেকর্ডার আছে, রেকর্ড প্লেয়ার আছে। রেডিও তো আছেই। সাবিত্রীকে অবশ্য আগেও নবীন দত্ত বিধবার বেশ পরতে দেন নি। কিন্তু এখন তার পোষাকের চটক তাঁর কাছেও খুব দৃষ্টিকটু

ঠেকল। মাথায় সিঁদুর নেই কিন্তু গলায় হার পরেছে, হাতে চুড়ি বালাও আছে। পরনে বেশ দামী শাড়ি, ব্লাউসের পিঠ কাটা, ঘাড়ের দিকটাও বেশ উন্মুক্ত। ঘৃণায় সমস্ত মনটা ভরে গেল নবীন দত্তের। তিনি কিছু বললেন না। চুপ করে বসে রইলেন। সাবিত্রী ভালো ভালো খাবার এনেছিল তাঁর জন্যে। একটিও খেলেন না। এই পরিবেশে পারুলবালাও কেমন যেন ভড়কে গেলেন। সহজভাবে কথাবার্তা বলতে পারলেন না। দু' চারটে মৌখিক লৌকিক আলাপ হল শুধু। নাতনীরা অবশ্য উচ্ছ্বসিত হয়ে নানা গল্প করতে লাগল। তারা চিড়িয়াখানায় গেছে, সিনেমায় গেছে, নেহরু গার্ডেনে গেছে। রেবতী নাচের স্কুলে ভরতি হয়েছে। নবীন দত্ত নীরব হয়ে বসে রইলেন। তাঁর সমস্ত মন দখল করে রইল অলঙ্কার। আসবার সময় খগেশ্বর অনুরোধ করলেন—'প্রতি রবিবারেই এখানে আসুন না।'

নবীন দত্ত হঠাৎ উত্তর দিলেন ইংরেজিতে। বললেন—'I am not blind. Good bye.'

আর যান নি সেখানে।

কিন্তু সমস্ত মন জুড়ে যে তুঁষের আগুন জ্বলছে মনে হচ্ছে তা আর নিববে না। পারুলবালা প্রথম দিনে ফিরে একটি কথাই শুধু বলেছিলেন—'যা ভয় করেছিলাম তাই হয়েছে।' ও বিষয়ে আর আলোচনাই হয় নি। কেউই কম্বলটা তুলতে সাহস পায় নি। কম্বলের তলায় যে বীভৎস মড়াটা শুয়ে আছে তার মুখদর্শন করবার ইচ্ছা ছিল না কারোর। পারুলবালা বারবার একটা কথাই বলছিলেন—'চল, আমরা দুমের কাছে চলে যাই।'

নবীন দত্ত বলেছিলেন—'দেখ, যে জন্যে আমি সাবিত্রীকে চাকরি

করতে মানা করি নি, তুমের খামখেয়ালীপনার মুখে লাগাম দিই নি, সেইজন্যে তোমাকে অনুরোধ করছি, আমাকে নিয়ে টানা-টানি কোরো না।'

'কি সেটা?'

সেটা 'স্বাধীন ইচ্ছা। কারও স্বাধীন ইচ্ছায় আমি বাধা দিই নি, দেব না। কিন্তু আমার স্বাধীনতাতেও হস্তক্ষেপ করতে দেব না কাউকে।'

পারুলবালা ঠিক বুঝতে পারলেন না। তাঁর মাথায় ঢুকল না। পারুলবালা নবীন দত্তের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন—'সমাজে বাস করলে কারো স্বাধীন ইচ্ছা থাকে না কি। সারা জীবনটাই তো পরের ইচ্ছায় চলেছি।'

নবীন দত্ত কোনও উত্তর দিলেন না। গুম্ হয়ে বসে রইলেন। পারুলবালা চলে যাওয়ার পর নিজের জাবদা খাতাটা পেড়ে লিখতে শুরু করলেন—

'পারুল যা বলে গেল তা সত্যি। সভ্য সমাজে থাকলে খানিকটা স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয়। কিন্তু আদর্শ বিসর্জন দিতে হয় যে সমাজে সে সমাজ অসভ্য বর্বর সমাজ। সমাজে স্বাধীনতা বিসর্জন দিই পরের হিতার্থে, কিন্তু আদর্শ বিসর্জন দিই নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করবার জন্য। পুরাণের সাবিত্রী স্বামীকে বাঁচাবার জন্য যমের পিছু পিছু ধাওয়া করেছিল। একালের সাবিত্রীরা ভোগী, স্বামী মরতে না মরতেই আর একটা পুরুষে আসক্ত হয় ভোগের লোভে। ভোগের লোভে বার বার পথ বদলানো মত বদলানো আধুনিক রীতি। এই রীতিকে অনুসরণ করছে পাশ্চাত্ত্য দেশ। তাদের মতো আমাদের শক্তি সামর্থ্য নেই তবু আমরাও

তাদের ব্যর্থ অনুকরণ করছি। ওদেশের চিন্তাশীল লেখকদের বই পড়ে মনে হয়েছে যদিও ভোগের সমুদ্রে ওরা সাঁতার কাটছে, কিন্তু শান্তি পাচ্ছে না। আমরা নকল-নবীশ। ভোগের প্রচুর উপকরণ আমাদের নেই, তাই আমাদের অশান্তি আরও বেশী। ভোগে একটা আপাত-আনন্দ পাওয়া যায়। বেশীক্ষণ সেটা থাকে না। তারপর অশান্তির আগুনে দগ্ধ হতে হয়, সে আগুন তুষানলের মতো। আমিও আগুনে পুড়েছি, এখনও পুড়ছি। কারণ আমিও ভোগের কাঙাল। তবে আমার একটা সান্ত্বনা আছে ভোগের জন্য আমি কখনও আদর্শ বিসর্জন দিই নি। কিন্তু এই সান্ত্বনাটুকু নিয়েও কি আমি সুখী হয়েছি? হই নি। তার কারণ আমার অহঙ্কার। আমি মনে মনে কামনা করেছি, সবাই আমার মতে চলুক। দুম বিদেশে না গিয়ে এদেশেই থাকুক, বিধবা সাবিত্রী আমার পুত্রবধূ হয়েই কাটিয়ে দিক সারাজীবনটা। আমি অবশ্য আমার কর্তৃত্বের নিষেধ তাদের উপর চাপাই নি, তাদের নিজের পথেই চলতে দিয়েছি। কিন্তু এজন্য আমার দুঃখ হয় নি একথা বললে মিথ্যে কথা বলা হয়। মনে খুবই আঘাত লেগেছে। পৃথিবীসুদ্ধ লোক আমার মনের মতো হোক এ আশা করলেই চোট খেতে হবে এবং সেটা হজম করে ফেলতে হবে। বাইরে সেটা প্রকাশ করলেই খেলো হয়ে যাব। সুতরাং যদিও মুখোশকে আমি ঘৃণা করি তবু আমাকে ওই মুখোশই পরে থাকতে হবে একটা। মানে, বাইরে যতই না আস্ফালন করি আমি নিষ্কাম নির্বিকার হতে পারি নি। সুখে বিগত স্পৃহ বা দুঃখে অনুদ্বিগ্ন থাকবার মতো মনের জোর আমার নেই। আমি ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ পালন করতে অক্ষম। তাই দুঃখ পাচ্ছি। এটা আমার

ন্যায্য পাওনা। আমি শুধু আমার ছেলে বউয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করতে চাই নি, অপর ছেলে মেয়েদের উপরও কর্ত্তৃত্ব করবার লোভ আমার ষোল আনা। শিশুসমা, রাখাল, ভূপেন, বিনয়—এদের উপরও আমি আমার হুকুমের দাবী চাপাতে ব্যস্ত। আমার স্পর্ধা সীমাহীন। ওদের আমি খুব ভালোবাসি তা ঠিক এবং সেইজন্যই মনে হয়েছিল ওরা সবাই আমার হুকুম মতো চলবে। তা যখন চলে নি তখন বুঝতে হবে আমার ভালোবাসাতেই কোনও খুঁত আছে বোধহয়। কিম্বা ভালোবাসার হয়তো এখন শক্তিই নেই যার জোরে তা অপরের স্বাধীন ইচ্ছাকে স্বমতে আনতে পারে। সে হয়তো আমারই পায়ের দড়ি। আমি অবশ্য কারো স্বাধীন ইচ্ছায় কখনও বাধা দিই নি। এইটুকুই হয়তো আমার সান্ত্বনা, কিন্তু এর জন্যে আমি মনে মনে অনেক কষ্ট পেয়েছি এইখানেই আমার পরাজয়।

আমার ব্যক্তিগত কথা থাক্। দেশের দিকে চেয়েও তো তেমন আশ্বাস পাই না। স্বাধীনতার সাতাশ বছর কেটে গেল, আমরা কতদূর এগিয়েছি? ইংরেজদের আমলে আমাদের অনেক দুঃখ ছিল, অনেক অপমান, অনেক গ্লানি আমাদের জীবনকে বিষাক্ত করে রাখত, স্বাধীনতা পেয়েও তা কিন্তু কমে নি। সকলেই স্বার্থপর। সকলেই অসাধু। সেই সেকালের মাৎস্য ন্যায়ের যুগ আবার ফিরে এসেছে যেন। দেশে মানুষ নেই, কেউ দেশকে ভালোবাসে না, কোন মহৎ আদর্শ নেই, দেশের ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠনের কোনও প্রয়াস নেই। এখনও বিশ্ববিদ্যালয় কেরাণী তৈরির কারখানা হয়ে আছে। বিদেশীদের নানা চক্রান্তের আভাস পাওয়া যাচ্ছে মাঝে মাঝে। বিদেশীদের কাছে ঋণে আমাদের মাথার

চুল পর্যন্ত বিকিয়ে গেছে। নাঃ, আর ভাবতে ইচ্ছে করছে না। এইখানেই থামি—

লেখা বন্ধ করে আবার বিদ্যাসাগরের ছবিটার দিকে চাইলেন। মনে হল ওই লোকটাও এ দেশের ভালো করতে গিয়ে সারা-জীবনটা কষ্ট পেয়েছে। সবাই ওকে ঠকিয়েছে।

হঠাৎ মনে হল বিদ্যাসাগরের চোখের দৃষ্টি যেন প্রখর হয়ে উঠল। তিনি যেন বললেন —'আমার কথা ভাবতে হবে না তোমাকে। তুমি নিজের চরকায় তেল দাও—'

৭

শিশুসমা রাখালকে শুধু উদ্ধারই করে নি, আরও অনেক কিছু করেছিল। রাখালের দোকানের সামনের যে দোকানদারটি নবীন দত্তের নোট—এন. দত্ত নাম দিয়ে চুরি করে ছেপেছিল তার নামে মোকদ্দমা রুজু করে দিয়েছিল সে। তার বাবা ধীরেশবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন একজন বড় এটর্নি। তিনিই এ ব্যাপারে তদ্বির করছেন। শিশুসমা একদিন এসে নবীন দত্তকে বললে সব। ভেবেছিল নবীন দত্ত বুঝি খুব বাহবা দেবেন। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। চুপ করে রইলেন।

'আপনাকে কিন্তু সাক্ষী দিতে হবে।'

'আমি ও সব পারব না।'

'শক্ত তো কিছু নয়, আদালতে গিয়ে শুধু বলবেন, ওই এন. দত্তের নোটবুকে যা ছাপা হয়েছে তা আমারই লেখা, ওর পাণ্ডু-লিপি রাখালের কাছে ছিল, তাকেই আমি ছাপবার অনুমতি দিয়েছিলাম, অন্য কাউকে দিই নি। আর একটা কি মজা হয়েছে জানেন ? ওরা বলছে, এন. দত্ত নবীন দত্ত নয়, নিবারণ দত্ত।'

নবীন দত্ত হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন।

'আমি ওসব জোচ্চোরের ছায়া স্পর্শ করব না। আমাকে তুমি রেহাই দাও।'

'বেশ, আপনাকে কোর্টে যেতে হবে না, আপনি লিখে দিন যে ওই এন. দত্ত মার্কা নোটবুকটা আপনারই, আর আপনিই সেটা ছাপবার অনুমতি রাখালকে ছাড়া আর কারুকে দেন নি। কোর্ট যদি আপনাকে শমন করে আপনি বলবেন—আমি খুব অসুস্থ। ডাক্তারের সার্টিফিকেট আমি যোগাড় করব—'

'আমি মিথ্যা কথা বলব কেন ?'

'মিথ্যে কেন ? আপনি সত্যিই তো খুব সুস্থ নন।'

নবীন দত্ত ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন মেয়েটার মুখের দিকে। না-ছোড়বান্দা জোঁক যেন একটা।

তাঁর ছাপা প্যাডটা নিয়ে শিশুসমা যা চাইছিল তাই লিখে দিলেন। না দিলে উঠবে না মেয়েটা।

শিশুসমা মুচকি হেসে বললে—'এইতেই হবে বোধহয়। যদি না হয় আপনাকে কোর্টে যেতে হবে না। যাতে বাড়িতে এসেই আপনার সাক্ষী নেওয়া হয় সে ব্যবস্থা করব।

হঠাৎ নবীন দত্ত জিজ্ঞেস করলেন—'তুই এত কাণ্ড করছিস কেন ?'

'আমার রোখ চড়ে গেছে।'

উত্তরটা শুনে খুশী হলেন নবীন দত্ত।

প্রণাম করে শিশুসমা চলে গেল। সে চলে যাবার পর একটা কথা মনে হল নবীন দত্তের—রাখাল তো আজকাল আসে না। ব্যাপার কি।

৮

নিমতলার শ্মশান ঘাটে গিয়ে বসেছিলেন নবীন দত্ত। মাঝে মাঝে এখানে আসেন তিনি। জায়গাটা যদিও মনোরম নয় তবু আসেন। এই নিমতলা ঘাটেই তাঁর বাবা মহাপ্রয়াণ করেছেন। এই ঘাটেই তিনি আগুন দিয়েছেন তাঁর মুখে। তাঁকেও অবশেষে এইখানে আসতে হবে। তাঁর সংসারযাত্রার এইটেই শেষ স্টেশন। মনে হল তার মুখে আগুন দেবে কে ? অলঙ্কার আগেই চলে গেছে, দ্রুমও জার্মানিতে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল এসব বাজে কথা ভেবে সময় নষ্ট করছি কেন। ওটা কি খুব দরকারি কথা ? কেউ না কেউ দেবেই। তারপর হঠাৎ মনে হল তাঁকে নিমতলায় নিয়ে আসবার লোক কি জুটবে ? পারুলও তো ছেলের কাছে চলে

যাবে বলে কোমর বাঁধছে। সাবিত্রী আর তাঁর পৌত্রী দুটি তাঁর নিকটতম আত্মীয়। কিন্তু তারা—হঠাৎ তাঁর মনে হল প্রথম জীবনে অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য কন্ট্রাসেপশন-এর (contraception) শরণাপন্ন হয়েছিলেন তিনি। এখন তাঁর মনে হল অন্তত একটা মূর্খ ছেলেও যদি থাকত তাহলে তিনি যেন বর্তে যেতেন। বিদ্বান না হয়ে মূর্খ হলেই যেন বেশী ভরসা পেতেন তিনি। কারণ মূর্খ হলেই সে তার কাছে থাকত, বিদ্বান হলে দূরে চলে যেত। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মন আত্মধিক্কারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ছি, ছি, এত স্বার্থপর তিনি? নিজের স্বার্থের জন্য এই হাস্যকর ঘৃণ্য কল্পনাও তাঁর মনে জাগছে? আশ্চর্য! মনের কদর্য পশুটা মরতে চায় না কিছুতেই। আত্মসুখের আশায় কান ধরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে পশুটা। স্তম্ভিত হয়ে একটা জ্বলন্ত চিতার দিকে চেয়ে বসে রইলেন নবীন দত্ত। মনের নেপথ্যে আলো-আঁধারিতে চিন্তার একটা মিছিল চলছিল, সে দিকে লক্ষ্য ছিল না তাঁর। সমস্ত অতীত জীবনটাই যেন অস্পষ্ট মিছিলের রূপ ধরে চলেছিল। হঠাৎ সেই মিছিলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর দিকে যেন ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন - 'দেখ, আমি আমার একমাত্র ছেলেকে ত্যাগ করেছিলাম। শেষ বয়সে আমার আপন লোক কেউ আমার পাশে ছিল না। আমার ডাঁট সহ্য করতে পারে নি কেউ। কারো সঙ্গে আপোস করি নি আমি। যা ভালো বুঝেছি তাই করেছি। মাথা চিরকাল উঁচু ছিল কিন্তু সুখী হই নি। সুখ যদি পেতে চাও আপোস করতে হবে। খোশামোদ করতে হবে। নিজের আদর্শকে দুমড়ে মুচড়ে নিজেকে খাপ খাওয়াতে হবে আর পাঁচটা

ইতরের সঙ্গে। যদি পার, সুখ পাবে, নচেৎ নয় ...। বিদ্যাসাগর হঠাৎ এলেন আবার মিলিয়ে গেলেন। আশ্চর্য জিনিস এই কল্পনা। মনে হল যেন প্রত্যক্ষ দেখলেন।

বল হরি - হরি বোল।

আর একটা মড়া এল।

নবীন দত্ত উঠে পড়লেন।

বরাবর হেঁটে বেড়ান। নিতান্ত দরকার না হলে তিনি ট্রাম-বাসে চড়েন না। সেদিনও হাঁটছিলেন। আজকাল রাস্তায় হাঁটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তায় ভীড় তো আছেই, ফুটপাথেও পা ফেলবার জায়গা নেই। ফুটপাথেও সারি সারি দোকান বসেছে. ফুটপাথেই ঘরকন্না পেতে বসবাস করছে অনেকে। খবরের কাগজে এ সব নিয়ে লেখালেখি করেছেন অনেকে। নবীন দত্তও মনে করেন—ব্যাপারটা অন্যায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হয় এরা যাবে কোথায়? সারা ভারতবর্ষের লোকই তো কোলকাতায় এসে জমা হয়েছে। বাইরের কাউকে আসতে দেব না, এ কথা কি বাংলাদেশ বলতে পারে? অন্য সব দেশে প্রাদেশিকতা আছে, বাংলা দেশ চিরকাল তার প্রতিবাদ করেছে। এখন কি সে বলতে পারে, না তোমরা কেউ এসো না। আর সকলকে বাদ দিয়ে সে কি চলতে পারবে? অন্য প্রদেশবাসী-দের সঙ্গ ও সাহচর্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে তার পক্ষে। সে কি একলা থাকতে পারে? এই সব ভাবতে ভাবতে পথ চলছিলেন তিনি। হঠাৎ একটা ধপধপে শাদা মোটর গাড়ি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'সার—'

চেয়ে দেখেন ভূপেন গাড়ি চালাচ্ছে। বিনয় তার পাশে বসে আছে। তাকে দেখে নেমে পড়ল তারা।

'আপনার বাড়ি থেকে আসছি। আরও দু'দিন ফিরে এসেছি। মা বললেন, আপনি আজকাল প্রায়ই বেরিয়ে যান। অথচ আমরা—'

'আমি তো তোমাদের বলেছি, আমি আর তোমাদের পড়াব না। তোমরা আমার চেয়ে বেশী বিদ্বান হয়ে গেছ। অন্য ভাষা শেখ এবার। জার্মানি, ফরাসী, স্প্যানিশ বা রাশিয়ান—এ সব পড়াবারও ভালো লোক না কি পাওয়া যায়। তাদের খোঁজ কর।'

'আমরা বড় একটা কাজ আরম্ভ করেছি দু'জনে। বইটার নাম দেব ড্রামা। ইংরেজিতেই লিখব। পৃথিবীর সব প্রধান প্রধান ভাষায় যত ভালো ভালো নাটক আছে, তারই আলোচনা করব। আমাদের কালিদাস, ভবভূতি, ভাস থাকবেন, গিরিশ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথও থাকবেন। ভারতের অন্যান্য ভাষায় নাটকেরও সন্ধান নেব আমরা। আপনাকে আমাদের 'গাইড্' হতে হবে'

আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন নবীন দত্ত—'আমি শ্রান্ত, ক্লান্ত, জর্জরিত—তাছাড়া আমার অত বিদ্যে নেই। আমাকে রেহাই দাও তোমরা—'

বিনয় বলল—'আচ্ছা, আপনি যা বলবেন, তাই হবে। কোথা যাচ্ছেন এখন—'

'বাড়ি যাচ্ছি—'

'চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিই।'

নবীন দত্ত গাড়িতে উঠতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু রাস্তার মাঝ-খানে একটা 'সীন' করবার ইচ্ছা হল না তাঁর। উঠে পড়লেন।

ভুপেন ছেলেটি খুব বুদ্ধিমান।

সে বলল—'সার, আপনিই আমাদের বরাবর পড়িয়েছেন। সাহিত্যের মর্মস্থলে আপনিই আমাদের নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন। আপনি তোতাপাখীর মতো নোট মুখস্থ করান নি, আপনি সাহিত্য-বোধ জাগাতে চেষ্টা করেছেন আমাদের মনে। আপনি সত্যিই আমাদের গুরু। এখন আমরা এ-তো বড় একটা কাজে হাত দিতে যাচ্ছি, আপনাকে বাদ দিয়ে তা কি সম্ভব? আপনাকে সার, থাকতেই হবে। শেকসপীয়রের নাটকগুলো সম্বন্ধে আপনিই ভূমিকা লিখবেন।'

'কিন্তু আমার বয়স হয়ে গেছে, কিছু লিখতে ইচ্ছে করে না।'

'আপনাকে লিখতে হবে না। আপনি ডিক্‌টেট্‌ করবেন, আমরা টুকে নেব।'

'লেখবার মেজাজও থাকে না যে সব সময়ে। তোমরা এলেই বিরক্তি ধরে, মনে হয় উঠলে বাঁচি। এ রকম লোককে নিয়ে তোমাদের চলবে কি করে? আমাকে বাদ দাও।'

উভয়েই সমস্বরে বলে উঠল—'না সাব, তা হয় না।'

নবীন দত্ত বুঝলেন, এদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। চুপ করে রইলেন। তাঁর বাড়ির সামনে তাঁকে নামিয়ে দিয়ে বিনয় বলল —'আমরা রোজই আসব সার। যেদিন আপনার 'মুড' থাকবে সেইদিনই লেখাপড়া হবে—তা না হলে চলে যাব।'

'বেশ—'

ঘরে ঢুকেই নবীন দত্ত একটি পোস্ট কার্ড পেলেন। দেবনাথের

পিসি বিশাখা লিখেছে। ছোট চিঠি।

মান্যবরেষু দাদা, দেবনাথকে আমি দূর করে দিলাম। ও কুলাঙ্গার। মতিচ্ছন্ন হয়েছে। একটা কৈবর্তের মেয়েকে বিয়ে করেছে। তুমিও ওকে বাড়িতে ঢুকতে দিও না। যদি আসে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিও। আমি ঝাঁটাপেটা করে বিদেয় করেছি। প্রণাম নিও। বৌদিকে দিও। ইতি বিশাখা।

নবীন দত্ত পোস্ট কার্ডটার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন। যদিও এসব জিনিস আজকাল হচ্ছে তবু তিনি দেবনাথের কাছে এটা আশা করেন নি। তাঁর ধারণা ছিল ছোকরাটি ভালো। কিন্তু এ কি কাণ্ড!

বিদ্যাসাগরের ছবির দিকে চাইলেন। মনে হল তাঁরও চোখে মুখে একটা নীরব ব্যঙ্গ যেন ফুটে উঠল। শেষে মনে হল তিনি নীরব ভাষায় যেন বললেন - সহ্য কর। উপায় কি!

একটু পরেই পারুলবালা এসে বললেন 'চল খাবে চল।'

'এত তাড়াতাড়ি কেন?'

মুখপুড়ি বিকেলে খানিকটা মাংস দিয়ে গেছে। কালীঘাটে মানত ছিল ওর। পাঁঠা বলি দিয়েছিল। সেই মাংস কুকারে রেঁধেছি। গরম গরম লুচি দিয়ে এখনই খেয়ে নাও না। আটটা তো বাজে।'

'চল।'

খেতে খেতে নবীন দত্ত বিশাখার চিঠির কথা বললেন। পারুলবালা বললেন, 'এ খবর আমি তো সাত দিন আগেই পেয়েছি। তোমার কষ্ট হবে বলে বলি নি।'

'তুমি কি করে খবর পেলে?'

'দেবুই আমাকে চিঠি লিখেছে।'

উঠে গিয়ে একটি ইনল্যাণ্ডের চিঠি এনে দিলেন।
খাওয়া শেষ করে চিঠিটি পড়লেন নবীন দত্ত। ছোট্ট চিঠি।
"শ্রীচরণেষু—
মামীমা, আমি একটি অপরাধ করে ফেলেছি। জানি না আপনাদের কাছে ক্ষমা পাব কি না। মামাবাবুকে ভয়ে চিঠি লিখতে পারি নি। জানি না আপনার আশীর্বাদ পাব কি না। আমি একটি কৈবর্ত মেয়েকে বিয়ে করেছি। বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছি। আমার পদস্খলন হয়েছিল। এ জন্য আমি খুবই লজ্জিত। কিন্তু মনে হল ওকে বিয়ে যদি না করি, তাহলে আরও লজ্জার কারণ হবে। আপনাদের আশীর্বাদ সততই কামনা করি। ইতি

প্রণত

দেবু।

'এ চিঠির তুমি কোনও উত্তর দিয়েছ ?'
'একটা পোস্ট কার্ডে লিখে দিয়েছি, তুমি বাবা বাধ্য হয়ে বে-লাইনে চলে গেলে, এ খবরে খুব সুখী হতে পারলাম না। তবু আশীর্বাদ করছি সুখী হও। আর কি লিখব ?'
নবীন দত্ত আর কিছু বললেন না। উপরে উঠে গেলেন। উপরে উঠে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুতে ঘুম এলো না। তারপর আলো জ্বেলে পড়বার চেষ্টা করলেন। ভালো লাগল না। বই বন্ধ করে আলো নিবিয়ে ছাতে এসে পায়চারি করতে শুরু করলেন। অনেকক্ষণ পায়চারি করলেন। মনের মধ্যে একটা ভাষাহীন কষ্ট টনটন করতে লাগল ফোঁড়ার মতো। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন, অগণ্য নক্ষত্র। ছেলেবেলায় যেমন দেখেছিলেন ওরা এখনও তেমনি আছে। স্বাতী আর চিত্রার দূরত্ব বদলায় নি।

অভিজিৎও ঠিক জায়গায় আছে। আকাশ-গঙ্গাওতেমনি ভাবেই বইছে। ছেলেবেলায় যে সমাজ ছিল সেটাই বদলে যাচ্ছে শুধু। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন শেষে। চোখের উপর একটা ছবি ফুটে উঠল। একটা নদী যেন প্রলয়ঙ্করী হয়ে উঠেছে। ধ্বস্ ভাঙছে। গ্রামের পর গ্রাম লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগল—নদীটা কে? কিন্তু কোনও উত্তর এল না মাথায়। স্বপ্নে দেখলেন যেন বিদ্যাসাগর এসেছেন। বলছেন—নদী তুমি, নদী আমি। আমরাই গড়ছি, আমরাই ভাঙছি।

কয়েকদিন দিন পরে শিশুসমার চিঠি এল একটা। নবীন দত্ত প্রথমে বুঝতেই পারেন নি এটা শিশুসমার চিঠি। খামটা উলটে পালটে দেখলেন। হাতের লেখাটা চেনা মনে হল তবু বুঝতে পারলেন না কার চিঠি। তাঁর কাছে খামের চিঠি বড় একটা আসে না। খামটা খুলে অবাক হয়ে গেলেন। কি এত লিখেছে শিশুসমা। ভ্রূকুঞ্চিত করে পড়তে শুরু করলেন।

শ্রীচরণেষু,

কাকাবাবু, আমার চিঠি পেয়ে আপনি একটু অবাক হবেন হয়তো। আগে তো কখনও আপনাকে চিঠি লিখি নি। লেখবার দরকারই হত না। আগে তো প্রায়ই আমার কাছে আপনি আসতেন।

আজকাল আব আসেন না। মনে হয় আমার উপর রাগ করে-ছেন। কেন করেছেন তা জানি না। মকোর্দমা করে আমি সেই জুয়াচোবটাকে জব্দ করেছি। আপনার নোট সে দশ হাজার কপি ছেপেছিল। কোর্টের রায় অনুসারে সে বইগুলো এখন আমাদের দখলে এসেছে। রাখালই তার বিলি ব্যবস্থা করছে। সে একটা ভালো দোকান ভাড়া করে বইয়েব ব্যবসায় আবাব নেবেছে। টাকাকড়ি অবশ্য সবই আমি দিয়েছি। রাখাল বলছে সে আপ-নাকে না কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে বইটাব জন্য আপনাকে পাঁচহাজার টাকা দেবে। সে টাকাটা সে আপনাকে দিতে চায়। আমিও ওর দোকানেব অংশীদার হয়েছি। আপনি অনুমতি কর-লেই আমি আপনাকে গিয়ে টাকাটা দিয়ে আসব। আপনার মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে আমি বাখালেব ব্যাপারে এতো জড়িয়ে পড়েছি কেন। জড়িয়ে পড়েছি তার কারণ রাখাল ছেলেটা বড় অসহায়। প্রথমত ও খুব গরিব, দ্বিতীয়ত খুব বোকা আব ভীতু। সংসারে চলতে হলে শুধু ভালোমানুষ হলেই চলে না, পৌরুষ চাই। ও তো আপনার ছাত্র, পড়াশোনায় খুব ভালো, স্বভাব চরিত্রও চমৎকার, কিন্তু এতো মুখচোবা যে কাবও সঙ্গে ভালো করে কথা কইতে পারে না। কেরাণীগিরি পেলে ও হয়তো তা কবতে পারত, কিন্তু চাকরিতে উন্নতি হত না। অথচ এতো ভালো, এতো নিবহঙ্কার, এতো সৎ যে কি বলব। তাই আমার মনে হয়েছে ওকে সাহায্য কবা উচিত। আমাবও তো কোনও কাজ নেই। সেতার শিখছি বটে, কিন্তু খালি সেতাব নিয়ে কি সারাক্ষণ থাকা যায়? তাছাড়া আর একটা কথা আবার মনে হয়েছে। সুর নিয়ে সারাক্ষণ তন্ময় হয়ে থাকবার মতো মন আমার

নয়। আমি ঠিক সুর-শিল্পী-গুণী নই। আমি ফ্যাসানের খাতিরে বাজনা শিখতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু ক্রমাগত ডারা ডারা করে আমার মন ভরছে না। বাবা যখন বেঁচে ছিলেন তখন বাবাকে নিয়ে অনেক সময় কাটত। এখন একা নিজেকে নিয়ে কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এমন সময় রাখালকে দিয়ে গেলেন আপনি। ভাবলাম ওর সঙ্গে বইয়ের ব্যবসাতে নেবে পড়ি। রাখালের মতো সৎ ছেলে যদি সাহায্যকারী হয় আর আমি যদি ভালো মূলধন দিতে পারি তাহলে ব্যবসাটা ভালোই চলবে বলে মনে হয়। আমি ভালো বইয়ের দোকান করতে চাই একটা। বাংলা, ইংরেজি আর সংস্কৃত বই রাখব ভেবেছি। ভালো হবে না ? আর একটা অনুরোধ করতে ইচ্ছে করছে কিন্তু সাহস হচ্ছে না। আপনি আমাদের পেট্রন হবেন ? মাঝে মাঝে আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব, আপনি আমাদের দোকানে আসবেন, আমাদের পরামর্শ দেবেন। আপনি যদি আপত্তি না করেন এর জন্য মাসে মাসে কিছু দক্ষিণাও আপনাকে দেব। আপনি আসুন আমাদের মধ্যে। আপনার উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকব। আমার সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি—

প্রণতা

শিশুসমা

চিঠি পড়া শেষ করে তিনি স্বগতোক্তি করলেন--'সবাই টাকা দিয়ে আমাকে অনুগ্রহ করতে চায়। সবাই সামনে এসে টাকার থলি নাড়ছে।' তাঁর হঠাৎ মনে পড়ল ভুম যাওয়ার সময় তাকে পাঁচহাজার টাকা দিয়ে গিয়েছিল। সেটা তিনি রেখে দিয়েছিলেন ফুলদানীর মধ্যে, খরচ করেন নি। গিয়ে দেখলেন, টাকাটা

তেমনিই আছে। একবার মনে হল তুমকে পাঠিয়ে দিই টাকাটা। আবার ভাবলেন একটু। নাঃ থাক্‌, ছেলেটা কষ্ট পাবে। টাকাটা না হয় পারুলকেই দিয়ে দেব।

শিশুসমাকে ছোট্ট একটা চিঠি লিখলেন।

মা শিশুসমা,

আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আমার দ্বারা আর কিছু হবে না। আমি যা পেন্সন পাই তাতেই আমার বেশ চলে যাবে। বেশী টাকার দরকার নেই। টাকা না হলে সংসার চলে না তা ঠিক, কিন্তু বেশী টাকা হলে সে সব সমস্যা অনিবার্য তা সমাধান করবার শক্তি আমার নেই। আশীর্বাদ জেন। ইতি—

শুভার্থী
নবীন দত্ত।

১০

সামান্য ঘটনা। নবীন দত্তের মনে কিন্তু গভীরভাবে দাগ কাটল। মনে হল তাঁর মর্মের কোমলতম অংশে কে যেন ছুরি চালিয়ে দিলে। হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলেন। ফুটপাথে হঠাৎ হোঁচট খেলেন। পড়তে পড়তে সামলে গেলেন টাল খেয়ে। একজন লোক ধরে ফেলল তাঁকে। উপদেশও দিল—'রাস্তা দেখে চলতে পারেন না মশায়।' নবীন দত্ত তাঁকে নমস্কার করে আবার এগিয়ে গেলেন। কোনও জবাব দিলেন না। কিছুদূর গিয়ে দেখেন মোড়ে চার-পাঁচটা ছেলে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। সকলেরই মাথায় বড় বড় চুল। মুখে গোঁফ দাড়ি। হিপির নকল। তাদের পাশ কাটিয়ে সরে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তাদের মধ্যে থেকে কে একজন

বলল, 'ওই দেখ শ্লা নবীন দত্ত যাচ্ছে। একের নম্বর হারামি বেটা, আমাকে ইংরেজিতে ফেল করিয়ে দিয়েছিল।'

নবীন দত্ত ঘাড় ফেরালেন না।

সোজা চলে গেলেন।

কিন্তু তাঁর অন্তরাত্মা বলতে লাগল—ধরণী দ্বিধা হও, প্রবেশ করি। বেরিয়েছিলেন হরতুকি কেনবার জন্য। একটি বিশেষ দোকান থেকে হরতুকি কেনেন তিনি। দোকানদারটি বুড়ো। তাঁকে খাতির করে, বেছে বেছে ভালো হরতুকি দেয়। শুধু দেয় না, জাঁতি দিয়ে কুঁচিয়ে টুকরো টুকরো করে দেয়। হরতুকি কিনে বাড়ি ফিরলেন। সেখানে একটি দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছিল। টেলিগ্রাম এসেছে—মা খুব অসুস্থ—অবিলম্বে চলে এস।

পারুলবালা মেয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন টালিগঞ্জে। এক ঘণ্টা পরে কাশীর গাড়ি। সে গাড়ি ধরতে না পারলে আজ যাওয়া হবে না। তিনি ঠিক করলেন একাই যাবেন। নিচের ভাড়াটেদের সব কথা বলে একাই বেরিয়ে গেলেন তিনি ট্যাক্সি করে। কাশীর ট্রেন ধরলেন ঠিক।

মণিকর্ণিকার ঘাটে মায়ের চিতা পুড়ছিল।

তার দিকে চেয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছিলেন নবীন দত্ত। তাঁর বয়স চুয়াত্তর বছব। মা মারা গেলেন চুরানব্বই বছর বয়সে। দুঃখ করবার কি আছে এতে? নবীন দত্ত তবু শিশুর মতো কাঁদছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল—শুধু মা নয়, তাঁরও সব যেন পুড়ে যাচ্ছে।